রমজানে জুম্‌আর খুতবা
এবং নিষ্ঠার সাথে নামাজ

রমজানে জুমুআর খুতবা এবং নিষ্ঠার সাথে নামাজ

গ্রন্থনায়

মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

এম এ (দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়)
বি এ অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ, মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়)
বি এ অনার্স (আরবি সাহিত্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
খতিব, পরিবাগ জামে মসজিদ
সম্পাদক, মাসিক জিজ্ঞাসা।

ও

সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি

উন্নয়ন বিশ্লেষক ও গবেষক
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মারযিয়া করিম ফাউন্ডেশন

প্রকাশনায়

MARZIA KARIM *Foundation*

রমজানে জুমুআর খুতবা এবং নিষ্ঠার সাথে নামাজ

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি
: মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : ২৪ ই জানুয়ারি ২০২৬/ ০৫ শাওয়াল ১৪৪৭

প্রথম সংস্করণ : ২৪ ই জানুয়ারি ২০২৬/ ০৫ শাওয়াল ১৪৪৭

প্রকাশক : MARZIA KARIM Foundation
E-mail: saalmuti@gmail.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকদ্বয় কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া : কুরআনের মর্মার্থ চর্চায় স্বতঃফূর্ত সহযোগিতা

Salat al Jumu'ah khutbah for Ramadan and Offering Salat with Devotion

Compiled and Edited by:
Syed Abdullah Al-Muti and Muhammad Tajul Islam
Published by:
Marzia Karim Foundation, Eskaton, Dhaka.
E-mail: saalmuti@gmail.com

প্রাথমিক কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবার ও কেয়ামত পর্যন্ত আসা তাঁর অনুসারীগণের উপর।

প্রতি শুক্রবারে মসজিদগুলোতে জুমুআর সালাতকে কেন্দ্র করে খুতবা প্রদান করা হয়। এ খুতবা হলো সামাজিক ব্যবস্থাপত্র। অর্থাৎ এর মাধ্যমে বিগত সপ্তাহের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পরবর্তী সপ্তাহের দিকনির্দেশনা জানান দেয়া হয়। আলোচক কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে গঠনমূলক পদ্ধতিতে তা জুমুআয় আগত মসুল্লিদের সামনে তুলে ধরেন। তাই সমাজ ও রাষ্ট্র সংস্কারে জুমুআর এ খুতবার বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। প্রতি শুক্রবারে লক্ষ লক্ষ মুসল্লি জুমুআর সালাতকে কেন্দ্র করে মসজিদে হাজির হয় কোনো প্রকারের আহ্বান বা চাপ প্রয়োগ ছাড়াই। সেখানে খতিবদের দেয়া বক্তব্যগুলো অল্প পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ মুসল্লির কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এটি ইসলামের এক মহান সৌন্দর্য।

খুতবার এহেন গুরুত্বের কারণে খুতবার বিষয় সমসাময়িক হওয়া অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ খুতবার বিষয়বস্তু বর্তমান সময়ের মুসলিমদের জীবন, সমস্যা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরী হওয়া। যা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে, শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, সামাজিক, নৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাগুলো নিয়েও আলোচনা করা, যাতে মুসল্লিরা তাদের বাস্তব জীবনে ইসলামী শিক্ষার প্রয়োগ ঘটাতে পারে। খুতবায় সমসাময়িক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলে তা মুসলিম উম্মাহর জন্য জ্ঞান, প্রেরণা এবং নৈতিকতার একটি শক্তিশালী উৎস হয়ে ওঠে।

রমাযান মাসকে ইবাদতের বসন্তকাল বলা হয়। এ মাসে বাকি ১১ মাসের ফসল ঘরে তোলতে হয়। ফসল যেন উত্তমভাবে তোলা যায় সে জন্য রমাযানকেন্দ্রিক কিছু বিষয় নিয়ে একটি ছোট্ট গ্রন্থ রচনার বাসনা নিজের থেকেই তৈরি হয়। উদ্দেশ্য এর দ্বারা খতিব ও সাধারণ মানুষের কাছে এ সংক্রান্ত দ্বীনী বিষয়গুলো সঠিক সূত্রে পৌঁছে দেয়া। তারই বাস্তবায়ন হিসেবে এ গ্রন্থ। আমার ধারণা, গ্রন্থটি শুধু খতিবদের নয়; বরং সব ধরনের পাঠকের ক্ষুধা পূরণে সক্ষম হবে ইনশা আল্লাহ।

গ্রন্থটিতে রমাযানের বিষয়াদির পাশাপাশি নামাজে আমরা যা পড়ি ও বলি তা বুঝে পড়ার ও বলার জন্য কিছু সহযোগী তথ্য প্রদান করা হয়েছে। কারণ, ইবাদতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামাজ। আর এ নামাজে সুরা ও তাসবিহ বুঝে পড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুরা ও তাসবিহগুলোর অর্থ যদি জানা থাকে, তাহলে অন্য চিন্তা মাথায় আসার সুযোগ পায় না। এতে অন্তর নরম হয়। আল্লাহর

সামনে বিনয় বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই অর্থ বোঝার কারণে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা অন্তরকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। ফলে নামাজ পূর্ণতা পাবে। এর মাধ্যমে মনোযোগ বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপন হয়, ইবাদতের গভীরতা বাড়ে এবং আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার মাধ্যমে নামাজে পূর্ণ মনোযোগ আসে, যা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনেও দেখা গেছে। এটি কেবল যান্ত্রিক পাঠ না হয়ে আত্মিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়।

আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ অর্থ বোঝার কারণেই নামাজে অনেকসময় আল্লাহর ভয়ে কান্না করতেন। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কেরাত পড়তেন তখন তাঁর বক্ষস্থলে হাঁড়িতে পানি ফোটার মতো কান্নার শব্দ পাওয়া যেত (সুনান আবু দাউদ: ৭৯৯)।

আবু বকর রা.-এর ব্যাপারি বর্ণিত আছে, তিনি সুরা পড়ার সময় কান্নার কারণে লোকদেরকে তা শুনাতে পারতেন না (সহিহ বুখারি: ৬৭৯)। মূলত এরকম নামাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন নামাজই প্রেমাস্পদের সঙ্গে কথোপকথনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। কিন্তু অর্থ না বুঝে নামাজ পড়লে স্বাভাবিকভাবে বুঝে পড়ার মতো আল্লাহর ভয়, খুশুখুজু ইত্যাদি সৃষ্টি হয় না।

'আল্লাহু আকবার' (আল্লাহ মহান) অর্থ জানলে আল্লাহর বিশালত্ব অন্তরে গেঁথে যায়। 'সুবহানা রব্বিয়াল আযিম' (আমার মহান রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি) অর্থ বুঝলে রুকুতে প্রশান্তি গভীর হয়। সুতরাং, সুরা ও তাসবিহ শুধু মুখস্থ পাঠ না করে, এর অর্থ অনুধাবন করে পড়া ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যকে পূরণ করে এবং বান্দার আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

গ্রন্থটি সহজ, সাবলীল ও নির্ভুল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতার কারণে ভুলত্রুটি বা বক্তব্যের অস্পষ্টতা থাকতে পারে। যেহেতু মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয় তাই যথেষ্ট সচেতন থাকা সত্ত্বেও ভুল থেকেই যেতে পারে। সঠিক তথ্য দিয়ে ভুল ধরিয়ে দিলে ও পরামর্শ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং দোয়া করব।

অবশেষে মহান আল্লাহর নিকট এ ক্ষুদ্র প্রয়াসের গ্রহণযোগ্যতা কামনা করছি। একজন পাঠকও যদি এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হন তবে আমাদের এ শ্রম কিছুটা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ আমাদের আশা পূরণ করুন। আমিন!

দোয়া কামনায়

মুহা. তাজুল ইসলাম

সূ । চি । প । ত্র

রমজান, রোজা ও আল-কুরআন	০১	৬৪	সুরা ফালাক-এ আমরা কী বলে থাকি
রমজানে দান-সদকার তাৎপর্য	১৩	৬৫	সুরা নাস-এ আমরা কী বলে থাকি
রমজানের শেষ দশক: গুরুত্ব ও আমল	২৭	৬৬	সুরা আসর-এ আমরা কী বলে থাকি
মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধির জন্য রমজানের শিক্ষা	৪১	৬৭	সুরা কাওছার-এ আমরা কী বলে থাকি
নিষ্ঠার সাথে নামাজের ফজিলত	৫৫	৬৮	সুরা কদরে আমরা কী বলে থাকি
কুরআনের আয়াতে দোয়া ও আত্মশুদ্ধির পরিচয়	৫৭	৬৯	তাশাহহুদ-এ আমরা কী বলে থাকি
সুরা ফাতিহা কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া	৫৯	৬৯	দরুদে ইবরাহিম-এ আমরা কী বলে থাকি
সানায় আমরা কী বলে থাকি	৬১	৭০	দোয়ায়ে মাসুরায় আমরা কী বলে থাকি
সুরা ফাতিহায় আমরা কী বলে থাকি	৬২	৭০	চারটি বিষয় থেকে আত্মরক্ষায় আমরা কী বলে থাকি
সুরা ইখলাস-এ আমরা কী বলে থাকি	৬৩	৭১	কুরআনে বর্ণিত ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু দোয়া

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মানুষের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মূল পরীক্ষা হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই উত্তম হওয়ার প্রতিযোগিতায়, আল-কুরআনের উপদেশ আলোর পথ দেখায়। একজন সচেতন মুসলমান কুরআনের শিক্ষাকে ধারণ করে উত্তম মানুষ হওয়ার পথে অবিচল থাকে এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করে।

মানুষকে সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয় করা হয়েছে এবং এই মহাবিশ্বের মালিক প্রদত্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ একটা অনন্য উপহার। মানুষের অন্তরে এবং আবেগে এই সচেতনতাকে জীবন্ত রাখার জন্য, নামাজ ও রোজার শিক্ষা অন্যতম ভূমিকা রাখে। রমজান মাসে কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করা এবং সৎকর্মের প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি হয়। অন্যদিকে, নামাজ হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েত ও প্রাণশক্তি চেয়ে আনার অবিরাম প্রচেষ্টা।

কুরআনে সুরা মুলক এ 'আহসানু আমালা', যার অর্থ 'কর্ম ও চেষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব'-এর কথাই জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরআনের শিক্ষাকে জীবনে সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমে কিভাবে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব, সেই চেষ্টায় আমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারি।

অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও, মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম ভাই এই প্রয়াসের সাথে থাকার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা। এই গ্রন্থের প্রচ্ছদকে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য করে উপস্থাপন করার জন্য হাসান আল ফরিদী এবং মোহাম্মাদ ফোরকান জাকিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আল-কুরআনের শিক্ষাকে সহজ করে উপস্থাপনের জন্যে মারযিয়া করিম ফাউন্ডেশনের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, ইনশা আল্লাহ। পরম করুণাময়-এর কাছে এই নিয়ত কবুল করার নিবেদন করি এবং এ সুযোগ দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাইয়েদ আবদুল্লাহ আল-মুতি
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৬

রমজানের প্রথম জুমুআর আলোচনা

রমজান, রোজা ও আল-কুরআন

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটে-ই সাহায্য চাই, এবং তাঁর কাছে-ই ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের অন্তরের কু-প্রবৃত্তিসমূহ হতে এবং খারাপ আমল হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে বিপদগামী করেন তাকে সৎপথে আনার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। তাঁর, তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবিগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের এ সৎপথের অনুসারী সকলের উপর মহান আল্লাহ অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

প্রিয় উপস্থিতি

আরবি মাসগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন মাস হলো রমজান মাস। রমজানের এ মাসটি মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক অতুলনীয় নেয়ামত। পার্থিব কোনো সম্পদের সাথে এর তুলনা করা যাবে না এবং তুলনা করতে যাওয়াও ঠিক হবে না। একে আমরা কুরআনের মাস হিসেবে জানি। মহান আল্লাহর রাশি রাশি করুণার ধারা বর্ষিত হয় এ মাসে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সাড়া পড়ে যায় ইবাদতের। পুরো মাসটিই মু'মিন ও ইসলামপ্রিয়দের নিকট ঈদের মাস, আনন্দের মাস ও অর্জনের মাস। এ মাসটিকে মহান আল্লাহ অসংখ্য নিয়ামত ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর মর্যাদা, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো:

১. তাকওয়া মজবুত করার মাস

তাকওয়া একটি পোশাক। পোশাক যেমন মানুষকে ঠান্ডা-গরম, যুদ্ধ-বিগ্রহ বিপদ-মসিবত থেকে রক্ষা করে, তাকওয়া তেমনি পাপ-পঙ্কিলতাসহ যাবতীয় অপরাধ থেকে রক্ষা করে। পোশাক যেমন দেহের সৌন্দর্য বাড়ায়, তাকওয়া তেমনি সামগ্রিক সত্তার সৌন্দর্য বাড়ায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, (وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ) 'তাকওয়ার পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক' (সুরা আরাফ ৭: ২৬)। তাকওয়া হলো, আল্লাহকে ভয় করে চলার রীতি। যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার

নীতি। সব জায়গায়, সব কর্ম সম্পাদনে আল্লাহ 'আমায় দেখছেন' এমন কল্পনা হৃদয়ে জাগরুক রেখে কলুষমুক্ত জীবন গড়ার নাম তাকওয়া। যার সাধনা সারাজীবন করে যেতে হয়।

আর এ তাকওয়া অর্জনের মোক্ষম সময় ও সুবর্ণ সুযোগ হলো, পবিত্র রমজান মাস। রমজানেই মানুষ সাধনা করার প্রয়াস পায়, নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ মেলে। কারণ, রোজার প্রকৃত হাকীকত ও তাৎপর্য হচ্ছে, তাকওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সওম ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার" (সুরা বাকারা ২: ১৮৩)।

তাই রমজান যেন আল্লাহভীরুতা ও প্রকৃত মানুষ গড়ার প্রশিক্ষণশালা। অন্য ইবাদতে যে রিয়া ও লৌকিকতার সুযোগ থাকে, রোজার বেলায় তা থাকে না। কারণ, একজন রোজাদার ইচ্ছে করলে আড়ালে রোজা ভেঙে ফেলতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে পানাহার ও সম্ভোগ থেকে বিরত থাকেন। এভাবে যদি সত্যিকারার্থেই রোজার হক আদায় করে রোজা রাখা যায়, তাহলে সারা বছর তাকওয়ার ওপর চলা সহজ হয়ে যায়।

২. নিয়ন্ত্রিত জীবনব্যবস্থার মাস

পুরো রমজান মাস আমরা রোজা রেখে থাকি। রোজাকে আরবি ভাষায় 'সওম' বহুবচনে 'সিয়াম' বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, বিরত করা, সংযম, নিয়ন্ত্রণ, দূরে থাকা, সংযত হওয়া, কোনো কিছুকে পরিত্যাগ করা, বারণ করা বা ফিরিয়ে রাখা, অবিরাম চেষ্টা-সাধনা ইত্যাদি। সওম মানুষকে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত রাখে, নফসকে বারণ করে এবং শয়তানকে বান্দার কাছ থেকে ফিরিয়ে রাখে বলেই এর নাম হচ্ছে সওম। হাদিসে সওমকে 'ঢাল স্বরূপ' বলা হয়েছে (সহিহ বুখারি: ৭৪৯২)। যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আক্রমণ থেকে ঢাল যেভাবে মানুষকে রক্ষা করে সওমও তেমনি কুপ্রবৃত্তি, সব অন্যায় কাজ, নফসের তাড়না, রিপু ও শয়তানের ধোঁকা থেকে সওম পালনকারীকে বাঁচায়। আর সওম তাদেরই বাঁচায় যারা এর উদ্দেশ্য বুঝে তা পালন করে।

কাজেই সুস্পষ্ট যে, রমজান মাস মানুষকে কুপ্রবৃত্তির দাসত্বমুক্ত থেকে উন্নত চরিত্র ও উত্তম গুণে গুণান্বিত হওয়ার শিক্ষা দেয়। রোজা মানুষের ভেতর ও বাহির উভয়

দিকের সংশোধন করে। মানুষকে ধৈর্য্য, সহনশীলতা ও সুশৃঙ্খল পরিপাটি জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। একজন রোজাদার প্রবল চাহিদা থাকার পরেও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। নিজের কামনা-বাসনাকে দমন করে। ধৈর্য্যরে সাথে ইফতারের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এক মিনিট আগেও ইফতার করে না। সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে সেহরি গ্রহণ, সময়মতো ইফতার গ্রহণ, যথাসময়ে তারাবিহ নামাজ আদায়সহ অন্যান্য নেক আমল পালনে সময়ানুবর্তী হওয়ার যে শিক্ষা রমজানকে কেন্দ্র করে পাওয়া যায় তার কিছুটাও সারা বছর চর্চা করতে পারলে মানবজীবন হবে আলোকিত। বিশেষ করে রমজান থেকে মানুষ যে তিনটি জিনিস শিক্ষা লাভ করে তা হলো-

ক. কম কথা বলার শিক্ষা;

খ. অল্প নিদ্রার অভ্যাস গঠন; এবং

গ. নিজেকে স্বল্প পানাহারের জন্য তৈরি করা।

আজকে অশান্ত পৃথিবীর সর্বত্র খুন, রাহাজানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জুলুম-নির্যাতন, অশ্লীলতা বেহায়াপনায় সব কিছুই মানুষের পশুপ্রবৃত্তির পরিণাম। বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, দলিত-মথিত মানবতা, মজলুমের ফরিয়াদে ভারাক্রান্ত আকাশ-বাতাস। পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তায় বিকলাঙ্গ এবং পঙ্গু মানব সভ্যতা। রোজার আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশিক্ষণই পারে মনুষের সেই পাশবিকতাকে দমন করতে। মোটকথা সিয়াম যাবতীয় জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ও তা বৈধ পথে পরিচালিত করার প্রশিক্ষণ দেয়।

৩. আদর্শিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়নের মাস

এ মাসে সওম পালনের দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহানত্বের ধারণা জাগ্রত হয়। রোজাদার ব্যক্তি কারো সাথে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে পারে না। কেউ তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করতে আসলে সে ক্ষেত্রে সওম তাকে তা থেকে বিরত থাকতে শেখায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ إِنِّى صَائِمٌ.

"তোমাদের কেউ যখন কোনো দিন রোজা অবস্থায় সকালে জাগ্রত হয় তখন সে যেন অশ্লীল ও মূর্খতাপূর্ণ কাজ না করে। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে মারামারি করতে উদ্যত হয় তবে সে যেন বলে, 'আমি

রোজাদার, আমি রোজাদার" (সহিহ মুসলিম: ২৭৫৯)। তাছাড়া এ মাসে অন্যায় কাজ সওমের পুরোপুরি প্রতিদান লাভেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَ الْجُوعُ.

"কত সওম পালনকারী রয়েছে যারা অনাহার ছাড়া আর কিছুই পায় না" (মিশকাতুল মাসাবিহ: ২০১৪; মুসনাদ আহমাদ: ৯৬৮৫)। অপর এক বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"যে মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করলো না তার পানাহার বর্জনে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই" (সহিহ বুখারি: ১৯০৩)।

৪. আত্ম-সংবরণ ও সহমর্মিতা শিক্ষা গ্রহণের মাস

মানুষের কু-প্রবৃত্তি চায় দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া করতে, রাতের বেলায় বিশ্রাম নিতে, মিথ্যা কথা বলতে, ধোকা দিতে, প্রতারণা করতে ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও সে সওম পালনের মাধ্যমে মানুষের ও কু-প্রবৃত্তির দাসত্ব অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর প্রাধান্য দেয়। এতে তার যত কষ্ট, ত্যাগ ও পরিশ্রমই হোক না কেন, সব স্বীকার করে নিতে সে রাজি।

রমজান মাসে সিয়াম সাধনা মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে ধনীরা গরিবের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা অনুভব করতে পারেন। কিছুটা হলেও উপলব্ধি করতে পারেন নিরন্ন দরিদ্র মানুষের একমুঠো খাবারের জন্য দ্বারে দ্বারে হাত পাতার কারণ। এই অনুভূতি জাগ্রত হওয়াই রোজা ও রমজানের অন্যতম শিক্ষা। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ،... وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَسَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، ... وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

"রমজান হলো সমবেদনা ও সহমর্মিতার মাস। যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে তার জন্য রয়েছে কৃতদাস আজাদ করার সওয়াব এবং গুনাহ

মাফের সুসংবাদ। আর যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে তৃপ্তিসহ খাওয়াবে তার গুনাহ মাফের পাশাপাশি আল্লাহ তাকে আমার হাউজ থেকে পানি পান করাবে যে, সে জান্নাতে যাওয়ার আগে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না। আর তার জন্য রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। এমনকি রোজাদারের সওয়াব থেকে সামান্যতম কমতি করা হবে না। আর যে ব্যক্তি তার কর্মচারীর কাজকে হালকা করবে মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন" (সহিহ ইবনু খুজাইমা: ১৮৮৭)।

৫. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নতকরণের মাস

সৃষ্টিকর্তা দয়াময় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে আসে পবিত্র মাহে রমজান। রমজান মাস মালিকের সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক বৃদ্ধির রাস্তা দেখিয়ে দেয়। মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া ও গোনাহ মাফের সুবর্ণ সুযোগ রমজান মাস। তাই দিনে রোজা ও রাতে নামাজের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ۝

"আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন" (সুরা বনি ইসরাইল ১৭: ৭৯)। রাত জাগরণ হলো আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও ঘনিষ্ঠ করার অন্যতম উপায়। আধ্যাত্মিক, মানসিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে রাত্রিকালীন ইবাদত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাত্রিকালীন ইবাদতের গুরুত্ব বিবেচনা করেই মহান আল্লাহ নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই আদেশ দিয়েছেন।

রমজান মাসে রাত্রি জাগরণ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সওয়াবের কাজ। এ জন্য রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ব্যাপকভাবে তাগাদা দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

"যে ব্যক্তি ঈমান (বিশ্বাস) ও ইহতেসাবের (সওযাবের প্রত্যাশায়) সঙ্গে ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগে তার পূর্ববর্তী গোনাগুলোকে ক্ষমা করে দেয়া হয়" (সহিহ বুখারি: ৩৭)। রাতে বেশি জাগরণের জন্য দিনে ঘুমিয়ে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সেহরির সময়টি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি সময়। এ সময়টিকে বিরাট একটি সুযোগ মনে করে একে কাজে লাগানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। মু'মিন বান্দাদের জন্য এ

সুযোগ হাতছাড়া করা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, তাদের যে সকল বৈশিষ্ট্য পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করা। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ মর্মে বলেন,

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞

"তারা শেষ রাতে (সেহরির সময়) ক্ষমা প্রার্থনা করে"।

মহান আল্লাহ এ আয়াতে ঐ সকল জান্নাতবাসীদের প্রশংসা করেছেন যারা শেষ রাতে দোয়া-প্রার্থনা করে ও ক্ষমা চায়। এর মাধ্যমে তারা জান্নাত লাভ করবে এর সুসংবাদও দেয়া হয়েছে। সেহরির সময়টা এমন একটি সময় যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন। কাজেই সে সময়টিতে দোয়া-প্রার্থনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

"আমাদের রব তাবারাকা ওয়াতা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ! যে আমার নিকট দোয়া করবে আমি তার দোয়া কবুল করব। কে আছ! যে আমার নিকট চাইবে আমি তাকে দান করব। কে আছ! যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব" (সহিহ বুখারি: ১০৭৭)।

শেষ রাতে সালাত আদায়ের ফজিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَأَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

"হে মানবসকল! তোমরা সালামের প্রচলন কর। অন্যকে খাবার দাও। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা সালাত আদায় কর তাহলে শান্তির সাথে জান্নাতে যেতে পারবে" (সুনান ইবন মাজাহ: ১৩৩৪)।

কাজেই মহান আল্লাহর কাছে রাতের শেষ প্রহরে ধর্ণা দেয়া, নিজের ভুলের জন্য অনুশোচনা ও রুনাজারি করা। গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহর কাছে রাতের শেষাংশে অনুশোচনা ও তওবা করা। যেহেতু রমজান মাস গোনাহ মাফের সুবর্ণ সুযোগ, তাই এ সুযোগ হাতছাড়া না করা।

৬. শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা অর্জনের মাস

সওম পালনের মাধ্যমে মানুষের শারীরিক সুস্থতা অর্জিত হয় এবং রোগ, বালা প্রভৃতি হ্রাস পায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ সওমের ওপর গবেষণা চালিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সওম দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মানুষের দেহের সুস্থতার জন্য বছরে কয়েকদিন উপবাস থাকা আবশ্যক। এতে তার দেহে চর্বি জমতে পারে না। সওমের ফলে পেটের এসিড হ্রাস পায় অনেক বেশি পরিমাণে।

ডা. বেন কিম Fasting for Health গ্রন্থে বেশ কিছু রোগের ক্ষেত্রে উপবাসকে চিকিৎসা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ, অনেক দিনের মাথা ব্যথা, অন্ত্রনালীর প্রদাহ, বয়সজনিত ডায়েবেটিস ইত্যাদি। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান সিয়াম পালনকে এক বাক্যে উপকারী হিসেবে রায় প্রদান করা হয়েছে। 'Scientific Indication in the Quran' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ "Allah clearly declares that fasting in Ramadan is good for mankind. We do not yet know all the physical and spiritual benefits of Ramadan fasting".

ডা. আদিব আল-গালেইনি আরব নিউজকে বলেন, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, কার্ডিওলজি এবং এন্ডোক্রিনোলজি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রমজান মাসে রোজা রাখা শারীরিক স্বাস্থ্যকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। রোজা রাখা মানবদেহের হজমের উন্নতি, বিপাক বৃদ্ধি এবং ওজন কমানোর জন্য উপকারী। এছাড়া রোজা শরীরকে ডিটক্সিফাই এবং পুনরুজ্জীবিত করে। যার ফলে মানব শরীর নতুন জীবনীশক্তি লাভ করে।

কার্ডিওলজিস্ট ও কনসালট্যান্ট এবং জেদ্দার আইএমসির কার্ডিয়াক সেন্টারের প্রধান ডা. সেরাজ আবুলনাজা বলেন, রোজা কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকির কারণগুলোর ওপর বেশ কিছু ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যেমন রক্তচাপ কমানো, কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানো, ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা উন্নত করা এবং ওজন কমানোর কাজ। আর এটি ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের মতো কার্ডিয়াক অসুস্থতার ঝুঁকিও হ্রাস করতে পারে (সূত্রঃ আরব নিউজ)।

৭. তারাবির সালাত আদায়ের মাস

রমজান মাসের বিশেষ উপহার তারাবির নামায। তারাবির নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করা হয়। আর কুরআন তিলাওয়াতের একটি আদব হলো– তারতিলের সঙ্গে তিলাওয়াত করা। অর্থাৎ তাজবিদের সঙ্গে থেমে থেমে পড়া, যাতে প্রতিটি শব্দ প্রতিটি অক্ষর বুঝে আসে। এভাবে পড়লে কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ পাওয়া

যায়, কুরআন বুঝতে ও তাতে চিন্তা করতে সুবিধা হয় এবং দিলের উপর প্রভাব পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন, "কুরআন তিলাওয়াত করুন ধীরে ধীরে, স্পষ্ট করে" (সুরা মুজ্জাম্মিল: ৪)। তারাবির নামাযেও এ আদবটি খেয়াল রাখা চাই। তারাবির নামায মাঝারি ঢঙে পড়াই সমীচীন– খুব ধীরে নয়, খুব দ্রুতও নয়। যেন তাজবিদের সঙ্গে একদম স্পষ্টভাবে প্রত্যেকটা অক্ষর উচ্চারণ করা হয়। মাখরাজ-সিফাত ও মাদ-গুন্নাহগুলো যেন যথাযথভাবে আদায় হয়।

প্রিয় উপস্থিতি

এবার আমরা রমজানে কুরআন নাজিল ও কুরআন তিলাওয়াত, তা অনুধাবন এবং তা বাস্তবায়ন নিয়ে কিছু কথা শুনব।

কুরআন অবতীর্ণের মাস

আল-কুরাআন সকল মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও মুক্তির দিশারী ও পথ প্রদর্শক। রমজান মাসেই আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থকে জীবন বিধান ও মুক্তির সনদ হিসেবে লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমানে প্রথমে একবার নাজিল করেন। এরপর আর কোনো আসমানি কিতাব নাজিল হয়নি, হবে না এবং প্রয়োজনীয়তাও নেই। কারণ, এটি মানুষের প্রয়োজনীয় সকল নিয়মাবলী, নির্দেশনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব ও তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

"রমজান মাস, যাতে কুরআন নাজিল করা হয়েছে মানুষের হিদায়াত, সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে" (সুরা বাকারা ২: ১৮৫)। অপর এক সুরায় তিনি বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ

"নিশ্চয় আমরা কুরআন নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে" (সুরা কদর ৯৭: ১)।

সুরা বাকারায় বলা হয়েছে, 'রমজান মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে'। আর সুরা কদরে বলা হয়েছে 'আমি কদরের রাতে কুরআন নাজিল করেছি'। এ থেকে জানা যায়, নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হেরা গুহায় যে রাতে আল্লাহর ফেরেশতা অহি নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রমজান মাসের একটি রাত। আর তা হলো কদরের রাত। সুরা দুখানে এটাকে মুবারক রাত বলা হয়েছে (সুরা দুখান ৪৪: ৩)।

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন লাইলাতুল-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এই যে, সমগ্র কুরআন লওহে মাহফুয থেকে লাইলাতুল-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরিল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌছাতে থাকেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কুরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে পূর্ণ তেইশ বছরে নাজিল করা হয় (আদওয়াউল বায়ান)।

কুরআন মাজিদ অবতীর্ণের দু'টি স্তরই রমজান মাসকে ধন্য করেছে। শুধু তাই নয়, বরং পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণের সহিফাও এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে বলে একটি বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

نَزَلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الإِنْجِيلُ لِثَلاَثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الزَّبُورُ لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَالْقُرْآنُ لأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

"রমজান মাসের প্রথম রাতে ইবরাহীম আ.-এর সহীফাসমূহ (আসমানি কিতাব) নাজিল হয়েছিল। আর রমজানের ষষ্ঠ রাতে তাওরাত নাজিল করা হয়েছিল। রমজানের তেরোতম রাতে ইনজীল অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং রমজানের আঠারতম রাতে যাবূর অবতীর্ণ করা হয়। আর কুরআন অবতীর্ণ করা হয় রমজানের চব্বিশতম রাতে" (আস-সিলসিলাতুস সহিহা: ১৫৭৫)।

রমজানে কুরআন তেলাওয়াত

কুরআন অর্থ পড়া, পাঠ করা, পাঠযোগ্য, যা বারবার পাঠ করা হয়। কুরআন মাজিদ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি পঠিত গ্রন্থ। পঠন-পাঠন ও বিদ্যার্জন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার নির্দেশ দিয়েই কুরআন মাজিদের প্রথম আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। 'পড়, তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানবকে রক্তপিণ্ড হতে। পড়, তোমার রব মহা সম্মানিত, যিনি লিপির মাধ্যমে শিক্ষাদান করেছেন; শিখিয়েছেন মানুষকে, যা তারা জানত না" (সুরা আলাক ৯৬: ১-৫)। কুরআন তেলাওয়াতকে লোকসানমুক্ত ব্যবসা বলা হয়েছে। এর প্রতিদান কখনো বিনষ্ট হয় না।

রমজানকে সম্মানিত ও বরকতময় করা হয়েছে কুরআন নাজিলের মাধ্যমে। তাই এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। সাধারণত কুরআন তেলাওয়াতে প্রতি হরফের বিনিময়ে ১০ নেকির ঘোষণা করা হয়েছে হাদিস শরিফে। আর রমজান মাসে সেই ১০ নেকির উপর আরও ১০ গুন বৃদ্ধি থেকে শুরু

করে আল্লাহ তাআলা যত ইচ্ছা বরকত দান করবেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে: "রোজা আমারই জন্য। এর পুরষ্কার আমি নিজেই দিব। আর প্রত্যেক নেক কাজের বিনিময়ে দশ গুন বৃদ্ধি করব" (সহিহ বুখারি: ১৭৭৩)।

ফলে একজন মুসলিমের জন্য রমজান মাস কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সওয়াব অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে আসে। রমজান মাসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন (সহিহ বুখারি: ১৭৮১)। ইমাম আবু হানিফা রহ. রমজান মাসে মোট ৬১ খতম কুরআন পড়তেন। রমজানের দিনে এক খতম এবং রাতে এক খতম করতেন। বাকি এক খতম পুরো রমজানের তারাবীহর নামাজে আদায় করতেন (তারিখে বাগদাদ: ত্রয়োদশ খণ্ড)। ইমাম বুখারি রহ. রমজান মাসের প্রতি রাতে ১ খতম কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, একাদশ খণ্ড)। আবু কাতাদা রহ. রমজান মাসে প্রতি ৩দিনে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। শেষ দশকে প্রতি রাতে ১ খতম দিতেন (সিয়ারু আলামীন নুবালা, ষষ্ঠ খণ্ড)।

কুরআন তেলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞

"যখন তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা ভরসা করে রাব্বুল আলামীনের উপর" (সুরা আনফাল ৭: ২)। এই আয়াতে কুরআন তেলাওয়াতকে ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বাড়বে ঈমান, আসবে রহমত।

কুরআন কেবল তেলাওয়াতের জন্য নয়; বরং বুঝার জন্যও

শুধু কুরআন তেলাওয়াত করলেই হবে না, চেষ্টা করতে হবে বোঝার। আল্লাহ তাআলা কুরআন বোঝার জন্য বারবার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞

"আমি আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি যেন তোমরা বুঝতে পারো" (সুরা ইউসুফ ১২: ২)। যদি বুঝতেই না পারলাম তাহলে কুরআনের মর্ম অনুধাবন করব কিভাবে? তেলাওয়াতের ফলে সওয়াব হয়তো হবে, কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন: "প্রকৃতপক্ষে মানুষের বোঝার জন্য আমি কুরআনে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যেন তারা অনুধাবন করতে পারে" (সুরা জুমার ৩৯: ২৭)।

কুরআন যদি না-ই বুঝি তাহলে অনুধাবন কিভাবে আসবে? আর কুরআনের অনুধাবনহীন লোকের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কঠোর ভাষায় বলেছেন:

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا ۞

"তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের কলবে সিলমোহর মারা?" (সুরা মুহাম্মাদ ৪৭: ২৪)।

সেজন্য রমজান মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি অর্থসহ বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে কুরআনের মর্ম অনুধাবনের। তাহলেই কুরআন তেলাওয়াতকারী হিসেবে প্রকৃত সফলতা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের আলোকে জীবন গড়া

জ্বিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলই আল্লাহর ইবাদতের জন্য। এর মাধ্যমে জ্বিন ও মানবজাতি যেমন দুনিয়ার জীবনকে পবিত্র-সুখ ও শান্তিময় করে গড়ে তুলে; তেমনি পরকালীন জীবনেও নাজাত, মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য লাভ করে। অতএব আমাদের জীবনের সব কার্যকারণ কুরআনের নির্দেশিত পথে চলে সুন্দরতম আল্লাহর পবিত্র বান্দা হয়ে নিজেদের চিহ্নিত করতে পারি। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের অনুসরণ এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ, সুন্নাত তরিকা যথাযথ আমল (বাস্তবায়ন) করতে পারি। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্তম আদর্শ, শিক্ষা ছিল হুবহু কুরআন। আয়েশা রা.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, বিশ্বনবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, আল কুরআনেরই হুবহু দৃষ্টান্ত।

কুরআন তেলাওয়াতের পদ্ধতি

কুরআন বিশুদ্ধভাবে শেখা ও সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করা জরুরি। মহান আল্লাহ বলেন,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۞

"আর ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে কুরআন পাঠ কর" (সুরা মুজ্জাম্মিল ৭৩: ৪)। যাঁরা পড়তে জানেন না তাঁদের শিখতে হবে, যাঁরা শিখে ভুলে গেছেন তাঁদের পুনরায় পড়তে হবে এবং যাঁরা ভুল পড়েন তাঁদের সহিহ-শুদ্ধ করতে হবে। তিন প্রকার লোকের তেলাওয়াতের ভুল মাফ: যাঁরা সহিহ করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, যাঁরা সহিহ করার চেষ্টায় রত আছেন এবং যাঁদের সহিহ শিক্ষার সুযোগ নেই বা সহিহ ও ভুলের জ্ঞান নেই।

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতে তিনটি ফরজ রয়েছে: হরফ বা বর্ণসমূহ সঠিকভাবে উচ্চারণ করা, হরকত বা স্বরচিহ্ন তাড়াতাড়ি পড়া, মাদ বা দীর্ঘস্বর হলে টেনে পড়া। কুরআন শরিফ পড়তে তিনটি কাজ করতে হয়: পবিত্র হওয়া (ফরজ), আউজুবিল্লাহ পড়া (ওয়াজিব) ও বিসমিল্লাহ পড়া (সুন্নাত)। তিনটি কাজে পবিত্রতা অত্যাবশ্যক: নামাজ পড়া, কাবা শরিফ তাওয়াফ করা, কুরআন শরিফ স্পর্শ করা।

কুরআন শোনার সাওয়াব

কুরআনের তেলাওয়াত শোনার সওয়াব রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা শোনারও নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহর প্রত্যেক নির্দেশ মেনে চলার সওয়াব রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞

"আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগসহ তা শোনো এবং নিশ্চুপ হয়ে থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত করা হয়" (সুরা আরাফ ৭: ২০৪)। তবে কুরআনের শ্রোতা কুরআন তেলাওয়াতের মতো অতটা ফজিলত পাবেন না। তেলাওয়াতের ব্যাপারে রাসুল ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট হাদিস রয়েছে যে, তেলাওয়াত হচ্ছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ ইবাদত আর শ্রবণ করা বা চুপ থাকা এই দুটি কুরআনুল কারিমের মর্যাদার কারণে ইবাদত হয়েছে।

অতএব আসুন, পবিত্র কুরআন মানব জাতির চিরন্তন সংবিধান, হেদায়েত, নসিহত, রহমত, বরকত অশেষ নেয়ামত। জীবন পথের পাথেয় হিসেবে কুরআনের নীতিমালা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি। মনে রাখবেন, বিশ্বাসী মানুষের জন্য ইহকাল-পরকালের মুক্তির সনদ হলো পবিত্র কুরআন। কুরআন মজিদের শিক্ষা এবং হজরত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করলেই আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবন শান্তি ও কল্যাণকর হবে। কাজেই কুরআনের তেলাওয়াত করা, হেফজ করা, বোঝা, শিখা ও সে অনুযায়ী আমল (বাস্তবায়ন) করার মধ্যে রয়েছে অশেষ সওয়াব, রহমত, বরকত, নেয়ামত ও নাজাত।

মহান আল্লাহ আমাদের এ রমজানটিকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রমজান হিসেবে উদযাপন করার তাওফিক দান করুন। আমিন!

রমজানের দ্বিতীয় জুমুআর আলোচনা

রমজানে দান-সদকার তাৎপর্য

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি একক, তার কোনো অংশীদার নেই। যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যিনি আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ একটি মাস রমজান প্রদান করে তাতে দান-সদকার মাধ্যমে নিজের ঈমান ও আমলকে শানিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যিনি রমজান মাসে বাতাসের গতির চেয়ে বেশি গতিতে দান করতেন। তাঁর পরিবারবগ ও তাঁর অনুসারীদের উপরও দরুদ ও সালাম নাজিল হোক যারা তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরই মতো আল্লাহর পথে দান-সাদকা করে গিয়েছেন।

প্রিয় উপস্থিতি!

আমরা আজ রমজানের দ্বিতীয় জুমুআ আদায় করতে যাচ্ছি। রমজান মাসে দান-সদকার বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলত রয়েছে। তাই আজ আমরা দান-সদকার ফজিলত সম্পর্কে জানব। বিশেষ করে রমজানে দান-সদকা ও সাহায্য সহযোগিতা করা কত যে মহৎ কাজ সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

গত সপ্তাহে আমরা জেনেছিলাম যে, রমজান সহানুভূতি, অনুকম্পা, স্বেচ্ছাসেবা ও দান-অনুদানের মাস। রমজান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসেও এসব বিষয়ের অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে। আর রমজান আসলে এর গুরুত্ব আরো অনেক বেশি বেড়ে যায। এসকল বিষয়ের কিছু উদাহরণের মধ্যে রয়েছে অভাবী কাউকে অর্থ দান করা, অন্যদের খাওয়ানো বা অসুস্থ বা আহত ব্যক্তির দেখাশোনা করা অথবা পরিবার বা সম্প্রদায়কে আমুলে সালেহো এবং সবরের প্রতি অনুপ্রাণিত করা।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দানের কথাটি সালাত বা নামাজের মতোই ৮২ বার উল্লেখ হয়েছে। 'জাকাত' শব্দটি পবিত্র কুরআনে আছে ৩২ বার, নামাজের সঙ্গে কুরআন মাজিদে আছে ২৬ বার; স্বতন্ত্রভাবে কুরআন কারিমে আছে ৪ বার; পবিত্রতা অর্থে রয়েছে ২ বার। জাকাত কখনো 'সদাকাহ' এবং কখনো 'ইনফাক' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইনফাক শব্দটি ব্যাপক, সদাকাহ শব্দটি সাধারণ ও জাকাত শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রমও হয়েছে, অর্থাৎ এ তিনটি শব্দ একে অন্যের স্থলে ব্যবহার হয়েছে।

আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতে সবসময় দান করতেন। অভাবের কারণে তাঁর ঘরে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বলত না। শুধুমাত্র খেজুর ও পানি পান করে মাসের পর মাস কাটাতেন (সহিহ বুখারি: ২৫৬৭)। তথাপি তাঁর কাছে দান করার মত কোনো কিছু থাকলে তা দান করার আগ পর্যন্ত তিনি প্রশান্তি লাভ করতে পারতেন না। একদিনের ঘটনা, তিনি আসরের সালাতের সালাম ফিরিয়ে দৌড়ে ঘরের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফেরৎ এসে সাহাবিদের জানালেন যে, তাঁর ঘরে দান করার মত কিছু পন্য ছিল; তিনি তা দান করে এলেন। এই ছিল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতার নমুনা। আর রমজান মাস আসলে তার দানের গতি আরো অনেক বেড়ে যেত। সহিহ বুখারির হাদিসে রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

"আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল রমজানে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরিল আ. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমজানের প্রতি রাতেই জিবরিল আ. তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন" (সহিহ বুখারি: ১৯০২, ৩২২০, ৩৫৫৪, ৪৯৯৭; সহিহ মুসলিম: ৩২০৮; মুসনাদ আহমাদ: ৩৬১৬, ৩৪২৫)।

দান-সদকা করতে গেলে শয়তান আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন উদ্রেকের মাধ্যমে তা থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। শয়তান যেসব প্রশ্নের মাধ্যমে আমাদের ধোঁকা দিতে চায় তার কিছু হলো– 'দান করলে তো সম্পদ কমে যাবে!', 'দান করে যদি হাতের সব খরচ করে ফেলি তাহলে আমার চলবে কী করে?', 'কী দরকার এত দান-সদকার? ইবাদত-আমল কি কম করি!', 'গরিবের আর দান কী? আগে বড়লোক হই, তারপর দান করবো!', 'হাতখুলে দেয়ার কী দরকার, ভিখারির হাতে দু'-চার টাকা দিলেই তো হলো!' ইত্যাদি। আমরা অনেকে বুঝতেই পারি না যে, এ সবই শয়তানের ধোঁকা। কেন বলছি শয়তানের ধোঁকা; কারণ, এ প্রশ্নগুলোর সবই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণার

বিপরীত। এখন আমরা জানব কুরআন ও হাদিসে দান-সদকার ফজিলত সম্পর্কে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলেছেন।

তারা বলেছেন, দান ও সদকা মানুষের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটি উপকারী মাধ্যম। যেমন হাদিসে এসেছে,

اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"তোমরা খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ" (সহিহ মুসলিম: ৭০৩-৭০৪)।

হাদিসে আরো বলা হয়েছে,

عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ.

"প্রত্যেক মুসলিমের উপর সদকা করা একান্ত জরুরি (সহিহ মুসলিম: ১০০৮)।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তা বিপদ দূরীকরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যেমন তিনি বলেছেন,

لَمَّا خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ، فَخَلَقَ الجِبَالَ، فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ، فَعَجِبَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الجِبَالِ. قَالُوا: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمُ الحَدِيدُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمُ النَّارُ. فَقَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمُ الْمَاءُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ المَاءِ؟ قَالَ: نَعَمُ الرِّيحُ. قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمُ ابْنُ آدَمَ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ.

"আল্লাহ তাআলা যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তা দুলতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাতে পর্বত সৃষ্টি করলে তা স্থির হয়ে যায়। তা দেখে ফেরেশতাগণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন: প্রভু হে! পর্বতের চেয়ে শক্তিশালী তোমার অপর কোন সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন: 'হ্যাঁ, এর চেয়ে শাক্তশালী হলো লোহা।' তারা বললেন: প্রভু হে! লোহার চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন: "হ্যাঁ, তা হলো আগুন"। তারা বললো: প্রভু হে! আগুনের চেয়ে শাক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন: 'হ্যাঁ, আগুনের চেয়ে শক্তিশালী হলো বাতাস। তারা আবার বললো: প্রভু হে! বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন: 'হ্যাঁ, আদম সন্তান

উদার চিত্তে যে দান করে তা (বিপদ দূরীকরণের ক্ষেত্রে) বাতাসের চেয়েও অধিক শক্তিশালী" (সুনান তিরমিযি: ৩৩৬৯; তবে এ হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল)।

দান-সদকা প্রদান করা মু'মিনগণের বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা রবের নিকট উত্তম প্রতিদান হাসিল হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَ اٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَ السَّآئِلِيْنَ وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَ الْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَ الصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۞

"ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হলো– যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবিগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, এতিম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকি (সুরা বাকারা: ১৭৭)।

সম্পদের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও দান করে– এর দু'টি অর্থ হতে পারে। **এক.** আল্লাহর ভালবাসায় উপরোক্ত খাতে সম্পদ ব্যয় করা। **দুই.** সম্পদের প্রতি নিজের অতিশয় আসক্তি ও ভালাবাসা থাকা সত্ত্বেও উপরোক্ত খাতসমূহে সম্পদ ব্যয় করা। উভয় অর্থই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে শেষোক্ত মতটিকেই অনেকে প্রাধান্য দিয়েছেন (তাফসিরে বাগভি)। এ মতের সপক্ষে বিভিন্ন হাদিসে সম্পদের আসক্তি সত্ত্বেও তা ব্যয় করার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এক হাদিসে এসেছে, "এক লোক রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! সব চেয়ে বেশি সওয়াবের সদকা কোনটি? রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তুমি সুস্থ ও আসক্তিপূর্ণ অবস্থায়, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়, ধনী হওয়ার আকাংক্ষা থাকা সত্ত্বেও সাদাকাহ করা" (সহিহ বুখারি: ১৪১৯; সহিহ মুসলিম: ১০৩২)।

এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারা এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরজ শুধুমাত্র জাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, জাকাত ছাড়া আরো বহু ক্ষেত্রে

সম্পদ ব্যয় করা ফরজ ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে জাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরজ হয়ে পড়ে। অনুরূপ যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরি করা এবং দ্বীনীশিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরজের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, জাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোনো অবস্থায় জাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের ফরজ হওয়ার বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত (মাআরিফুল কুরআন)।

অপর এক আয়াতে খাঁটি ও যথার্থ মু'মিনের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান রব এ দান-সদকার কথাও বলেছেন। তিনি বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ۞

"মু'মিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে" (সুরা আনফাল ৮: ২-৩)।

পক্ষান্তরে জাকাত না দেয়া কাফিরদের বৈশিষ্ট্য ও জাহান্নামের শাস্তির অন্যতম কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۞

"আর ধ্বংস মুশরিকদের জন্য; যারা জাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসী" (সুরা ফুসসিলাত ৪১: ৬-৭)।

জাকাত প্রদানের মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করা যায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ.

"যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করবে সে ঈমানের স্বাদ ও মজা লাভ করবে; যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং জানবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর আনন্দিত চিত্তে পবিত্র মনে তার সম্পদের জাকাত প্রদান করবে" (সুনান আবু দাউদ: ১৫৮৪)।

দান-সদকা প্রদানকারী ব্যক্তির ছোট ছোট গুনাহসমূহ তার দান-খয়রাতের মাধ্যমে মুছে যায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

"আর সাদাকাহ (জাকাত ও দান) গুনাহকে মিটিয়ে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে মিটিয়ে দেয়" (সুনান তিরমিযি: ৬১৪; সুনান নাসায়ি: ১১৩৯৪)।

জাকাত আদায়ের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদের অকল্যাণ দূরীভূত হয়। জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি কোনো ব্যক্তি তার মালের জাকাত আদায় করে তাহলে তার ব্যাপারে আপনি কী মনে করেন। তখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.

"যে তার মালের জাকাত আদায় করলো তার সম্পদের অকল্যাণ ও অমঙ্গল দূর হয়ে গেল" (আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব: ৭৪৩)।

জাকাত আদায়ের ফলে জাকাত আদায়কারীর ধন-সম্পদ কমে না, বরং বাড়ে। অনেকের ধারণা যে, জাকাত প্রদান করলে সম্পদ কমে যায়। কিন্তু আল্লাহ বলেন, তাঁর পথে ব্যয় করলে তিনি সম্পদ আরো বৃদ্ধি করে দেন। পবিত্র কুরআনে এ মর্মে তিনি ঘোষণা করেন,

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ ۝

আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন (সুরা বাকারা ২: ২৭৬)। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের কারণে সুদের সাথে সদকা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুদ ও দান-সদকা উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণতঃ যারা এসব কাজ করে, তাদের উদ্দেশ্য এবং নিয়্যতও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে মেটানো আর দান-সদকাকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? সাধারণ তাফসিরকারগণ বলেন, সুদকে মেটানো এবং দান-সদকাকে বাড়ানো আখেরাতে তো হবেই, কিন্তু

এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়। যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। তাই তো রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্তিঃ "সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা" (মুসনাদে আহমাদঃ ১/৩৯৫)।

অপর এক আয়াতে তিনি আরো বলেন,

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۞

"আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত" (সুরা রোমঃ ৩৯)। এ বৃদ্ধির কোন সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। যে ধরনের ঐকান্তিক সংকল্প, গভীর ত্যাগের অনুভূতি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রবল আকাংখা সহকারে কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে। অনুরূপভাবেই আল্লাহ তাকে বেশি বেশি প্রতিদানও দেবেন। তাই একটি সহিহ হাদিসে বলা হয়েছে,

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

"যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত মাল সদকা করে, আল্লাহ তাআলা হালাল অর্থাৎ পবিত্রকেই কবুল করেন। তাহলে উক্ত সদকা সে আল্লাহর হাতে দিল। আল্লাহ তাআলা তাকে এভাবে লালন-পালন করেন, যেভাবে তোমরা ঘোড়ার বাচ্চা কিংবা উটের বাচ্চা লালন-পালন কর। শেষ পর্যন্ত সেই সদকা (বর্ধিত হয়ে) পর্বতসমান হইয়া যায়" (সুনান তিরমিযিঃ ৬৬২; মুসনাদে আহমাদঃ ২/৪৭১)।

অর্থনীতিবিদদের মতেও দান-সদকা সম্পদ বৃদ্ধি করে, সম্পদ কমায় না। তারা এভাবে যুক্তি দেন যে, সম্পদশালী ব্যক্তিরা যদি দান-সদকা করে তবে তাদের সে অর্থ আবার তাদের নিকটই ফিরে আসে। কারণ, যাদেরকে অর্থ দিল তারা এ অর্থ দিয়ে বাজার থেকে যে সব পণ্য ক্রয় করবে এগুলো সে সম্পদশালী ব্যক্তিদেরই ফ্যাক্টরী বা গার্মেন্টস বা কোম্পানির পণ্য। সুতরাং ঘুরেফিরে তাদের অর্থ তাদের হাতেই যায়।

দান-সদকা করার আরো একটি ফায়দা হলো, দানকারী ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান লোকদের মাঝে বৃদ্ধি পায়। মানুষ তার দানশীলতা, বদান্যতা ও প্রশস্ত অন্তরের বিষয়টি জানতে পারে। পাশাপাশি জাকাত তাকে কৃপণ হওয়ার বদনামী থেকে রক্ষা করে। সে সকল প্রকার ব্যয়কুণ্ঠতা থেকে পবিত্র হয়ে যায়। এদিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ তার প্রিয় বন্ধুকে আদেশ দিয়েছিলেন,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

"তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দো'আ কর, নিশ্চয় তোমার দো'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সুরা তওবা ৯: ১০৩)। এটা সাধারণ আদেশ। সদকা থেকে উদ্দেশ্য ফরজকৃত সদকা অর্থাৎ জাকাত হতে পারে, আবার নফল সদকাও হতে পারে। এখানে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, সদকা দ্বারা তুমি মুসলিমদেরকে পবিত্র কর। এতে এই কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, জাকাত ও সদকা মানুষের আখলাক-চরিত্রকে পবিত্র করার একটি বড় উপায়। এ ছাড়া সদকা কে সদকা এই জন্য বলা হয় যে, সদকাদাতা নিজের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। দ্বিতীয় বিষয় এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, সদকা উসুলকারীর উচিত, সদকাদাতার জন্য দোয়া করা। যেমন এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজ পয়গম্বর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন এবং নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আদেশ অনুযায়ী দোয়া করতেন (ইবনে কাসির)।

দান-সদকা করার দ্বারা সমাজের অনাহারক্লিষ্ট ও অভাবী ব্যক্তিদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণ হয়। তাদের মনের আফসোস দূরীভূত হয়। সঠিকভাবে জাকাত আদায় ও দান-সদকার মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণও সম্ভব হয়। মূলতঃ সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণই জাকাতের প্রধান ও মূল উদ্দেশ্য। তাছাড়া এ জাকাত যথাযথ আদায়ের ফলে সমাজের লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

দানের পরিমাণ কী হবে এবং কোন দান সর্বোত্তম

ফরজ দান তথা জাকাতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। কারো কাছে যদি জাকাত আদায়যোগ্য নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তবে শতকরা আড়াই টাকা হারে তাকে জাকাত আদায় করতে হয়। জাকাত যদি ফরজ হয়, তবে একজন মুসলিমের জন্যে এ জাকাত আদায় থেকে বিরত থাকার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু নফল দানের

ক্ষেত্রে এমন কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। ধনী-গরীব যে কেউ যখন ইচ্ছা দান করতে পারে। কম-বেশি যে কোনো পরিমাণই দান করতে পারে। দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও। প্রশ্ন হল, কোথায় কখন কীভাবে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে বেশি? কোন্ দানটি আল্লাহ তাআলার নিকট সেরা দান হিসেবে বিবেচিত হবে? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা সরাসরি নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ-নিঃসৃত হাদিসেই খুঁজে পাই। কখনো বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে তিনি নিজেই সেরা দানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। কখনো কোনো সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন সেরা দান কোনটি। কয়েকটি হাদিস লক্ষ করুন-

<u>এক.</u>

হাকীম ইবনে হিযাম রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

"সর্বোত্তম সদকা সেটাই, যা নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়। দাতার হাত গ্রহীতার হাতের তুলনায় উত্তম। আর (যখন অর্থব্যয় করবে তখন) তোমার পোষ্য ও অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করবে (সহিহ মুসলিম: ১০৩৪)।

বলা হয়েছে-যাদের প্রতিপালনের ভার তোমার ওপর ন্যস্ত, তোমার অর্থব্যয়টা তাদেরকে দিয়েই শুরু করো। তাদের প্রয়োজনটা আগে মেটাও। তিনি আরো বলেন,

مَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ.

"তুমি যা কিছুই ব্যয় কর, সেটাই তোমার জন্যে সদকা, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যে নলাটি তুমি তুলে দাও সেটাও" (সহিহ বুখারি: ৫৩৫৪)। -

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ একজন আল্লাহবিশ্বাসী মু'মিন ব্যক্তি তো আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই ব্যয় করবে। যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, যে কাজে তাঁর বিধান লঙ্ঘিত হয়, সে কাজে মু'মিন কী করে আল্লাহর দেয়া নিআমত ও রিযিক নষ্ট করবে? আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন, এর ভাষ্য আরো পরিষ্কার, আরো আলোছড়ানো। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ. أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

"একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি দাসমুক্তির জন্যে ব্যয় করেছ, একটি দিনার তুমি কোনো মিসকীনকে সদকা করেছ, আরেকটি দিনার তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ। এসবের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিদান সেটাতেই পাওয়া যাবে, যা তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্যে ব্যয় করেছ" (সহিহ মুসলিম: ৯৯৫)।

তবে এ দানের ক্ষেত্রেও যেন স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘিত না হয়, নিজের এবং পরিবার-পরিজনের বৈধ অপরিহার্য প্রয়োজনাদি মেটানোর দিকটি যেন উপক্ষিত না হয়, ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাও দেয়। কুরআনে মহান রাব্বুল আলামীনের অমোঘ নির্দেশনা-

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا.

"(দান না করে) তুমি তোমার হাতকে গলায় আটকে রেখো না, আবার তা সম্পূর্ণরূপে বিছিয়েও দিয়ো না। অন্যথায় তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে পড়বে" (সুরা ইসরা ১৭: ২৯)।

কার্পণ্য করা যাবে না। দান করা থেকে সবসময় হাত গুটিয়ে রাখা যাবে না। কোনো উপলক্ষ যখন আসে, সাধ্যমতো সেখানে দান করতে হবে। পরিমাণে তা কম-বেশি যা-ই হোক। এটা মু'মিনের গুণ, মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তাই বলে নিজেকে অভাবের মুখে ঠেলে দিয়ে সবকিছুই দান করে দেয়া-এটাও ইসলামের শিক্ষা নয়। সাহাবায়ে কেরাম নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন-তারা কোন্ সম্পদ দান করবে? এ প্রশ্নটি উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন,

قُلِ الْعَفْوَ.

"আপনি বলে দিন, যা (তোমাদের প্রয়োজনের) অতিরিক্ত" (সুরা বাকারা ২: ২১৯)।

দুই.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনি প্রশ্ন করেছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন্ সদকা সবার সেরা? রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন,

جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

"অর্থসম্পদ যার কম, যে অসচ্ছল, কষ্ট করে সে যা দান করে (সেটাই সর্বোত্তম সদকা)। আর তুমি তোমার অধীনস্তদের দিয়ে শুরু করো" (সুনানে আবু দাউদ: ১৬৭৯)।

তিন.

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিস, এক ব্যক্তি এসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কোন্ সদকায় সবচেয়ে বেশি সওয়াব হবে? রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিয়েছেন-

أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى. وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.

"যখন তুমি সুস্থ-সবল, তোমার উপার্জিত সম্পদ তুমি তোমার নিজের কাছে রেখে দিতে চাচ্ছ, অভাবে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তোমার রয়েছে, তুমি সচ্ছলতার স্বপ্নও দেখ-এমন পরিস্থিতিতে তুমি যে দান করবে (সেটাই তোমার জন্যে অধিক প্রতিদান বয়ে আনবে)। (দান-সদকার ক্ষেত্রে) তুমি এতটা বিলম্ব করো না যে, তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হল আর তখন তুমি বলতে থাকলে-এটা অমুকের, এটা তমুকের। শোনো, এটা তো তখন অন্যদেরই হয়ে যায়" (সহিহ মুসলিম: ১০৩২)।

মানুষ যতদিন সুস্থ-সবল থাকে, দুনিয়ার রঙিন স্বপ্ন তাকে হাতছানি দিতে থাকে। একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের আশায় সে বিভোর থাকে। অভাবের মুখে পড়ার আশঙ্কাও মনে উঁকি দেয়। আর শয়তান তো এ ভয় দেখানোতেই লিপ্ত। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ

"শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভয় দেখায় আর তোমাদেরকে মন্দ কাজের (কৃপণতার) আদেশ করে" (সুরা বাকারা ২: ২৬৮)।

চার.

আরেকটি হাদিস। এখানে অবশ্য সরাসরি সেরা দানের কথা নেই। তবে রয়েছে একটি অনন্য মর্যাদা ও ফযীলতের কথা। রোজ হাশরে যখন সূর্য থাকবে খুব কাছাকাছি, তাপে আর তৃষ্ণায় মানুষ থাকবে অস্থির, হাদিসের ভাষ্যানুসারে, কঠিন সে মুহূর্তে সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তাআলা নিজ ছায়ায় স্থান দেবেন। তাদের অন্যতম-

رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.

"এমন ব্যক্তি, যে এতটাই গোপনে দান করে, তার ডান হাতের দান বাম হাতও জানতে পারে না" (সহিহ বুখারি: ১৪২৩)।

গোপন দানে ইখলাস, আন্তরিকতা ও সওয়াবের প্রত্যাশা বেশি থাকাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহ তাআলা এ ইখলাসেরই মূল্যায়ন করেন।

অবশ্য গোপন দানের ফযীলতের কথা শুনে প্রকাশ্য দানকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআনে গোপন-প্রকাশ্য উভয় দানের কথাই বলা হয়েছে-

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ

"যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তা কতই না উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং গরীবদের দিয়ে থাক তবে তা আরো উত্তম" (সুরা বাকারা ২: ২৭১)।

আসলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত! আপনি এক টাকা দান করুন বা এক কোটি- কোনো পরিমাণেই আল্লাহর কিছু যায় আসে না। কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে নিজের যা আছে সেখান থেকে ভালো পরিমাণ অকাতরে দান করে তখন তিনি সেই বান্দার প্রতি খুশি হন।

এই তো ইসলাম। একটু সচেতন হলেই এখানে রয়েছে আঁচল ভরে নেয়ার সুযোগ। দান-সদকার ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভারসাম্য মেনে চলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নফল দানের আগে ফরজ দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবার সীমিত আয়ের অসচ্ছল কেউ যখন কষ্ট করে সামান্যও দান করে, সেটাকে বলা হচ্ছে সেরা দান। বিপদাপদ দূর করার জন্যে দান করতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, কিন্তু উৎসাহিত করা হয়েছে সুস্থ কর্মক্ষম স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বেশি পরিমাণে দান করার প্রতি। সে দান প্রকাশ্যে হতে পারে, হতে পারে গোপনেও। দানের এ শিক্ষা যদি ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের জীবন ও সমাজ তবে আলোকিত হবেই।

জাকাত অনাদায় বা দান-খয়রাত না করার শাস্তি

সম্পদশালী ব্যক্তিদের যারা দান-খয়রাত করে না তাদের জন্য পবিত্র কুরআনে ও হাদিসে অসংখ্য সতর্কবাণী ও ভীতিপ্রদ শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ
يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ۞

“এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ আস্বাদন কর” (সুরা তওবা: ৩৪-৩৫)। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ.

“আল্লাহ যাকে সম্পদ দিল কিন্তু সে তার জাকাত আদায় করলো না, তার সম্পদকে কিয়ামতের দিন ভয়ঙ্কর সাপের রূপ দেয়া হবে যার দু’টি বিষাক্ত দাঁত হবে। কিয়ামতের দিন তা তার গলদেশে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তা তার দু’পার্শ্ব থেকে তাকে নিষ্পেষিত করবে এবং বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার খাজানা” (সহিহ বুখারি: ১৪০৩)।

জাকাত আদায় না করার কারণে শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তিটিই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং জাকাত যথাযথ আদায় না করা হলে সমাজে বিপর্যয় ঘটে, আল্লাহর গজব নেমে আসে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যদি কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা জাকাত প্রদান না করে তাহলে তারা অনাবৃষ্টির শিকার হয়। যদি পশু-পাখি না থাকতো তবে তারা বৃষ্টি থেকে একেবারেই বঞ্চিত থাকত” (সুনান ইবন মাজাহ: ৪০১৯)।

প্রিয় মুসল্লিবৃন্দ!

রমজানে প্রতিটি ভালো কাজের নেকি ৭০ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ মাসে যত বেশি দান-সদকা করা যাবে, তা বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। আমরা দেখি যে, বাজারে যখন ‘একটি কিনলে আরেকটি ফ্রি’-এর অফার দেয়া হয় তখন ক্রেতাগণ তা কেনার জন্য অধির আগ্রহ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েন। অফারটিকে লুফে নেয়ার ব্যাপারে কেউই ভুল করতে চান না। মহান আল্লাহ কিন্তু রমজানে একটি কিনলে ৭০টি পাওয়ার অফার দিয়েছেন। আর তা যদি হয় দান-সদকা করার সাথে সম্পৃক্ত তাহলে আর

কোনো কথা নেই। তা ৭০০ গুণ বা তার চেয়েও বেশি বাড়ার কথা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۞

"যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ' দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ (সুরা বাকারা: ২৬১)।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রিয় উম্মতকে রমজান মাসে বেশি পরিমাণে দান করতে উৎসাহিত করতেন। রমজান মাসে একটি নফল আমল ফরজের মর্যাদায় সিক্ত। সে হিসেবে রমজান মাসে আমাদের প্রতিটি দান-সদকাই ফরজ হিসেবে আল্লাহতায়ালার কাছে গণ্য। দান-সদকার এমন ঈর্ষণীয় ফজিলত অন্যান্য মাসে কখনোই পাওয়া যাবে না। শুধু রমজানেই এই অফার সীমাবদ্ধ। তবে এই সুযোগ সীমিত সময়ের জন্যে! কাজেই মু'মিন বান্দাদের মহান আল্লাহর এ অফার লুফে নেয়া উচিত।

আসুন, আপনজনকে ভালোবাসি, গরিবকে সম্মান করি, সবাইকে ক্ষমা করি, আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিই, তাঁদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখি। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে তোমার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে, তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ো; যে তোমার প্রতি অবিচার করে, তাকে ক্ষমা করো।' (তিরমিজি)। রহমত ও মাগফিরাত দয়া ও ক্ষমার অনুশীলন করি। ক্রোধ ও প্রতিশোধপরায়ণ হওয়া শয়তানি বৈশিষ্ট্য। এর থেকে মুক্তিলাভে সচেষ্ট হই। আল্লাহর সব বান্দার সঙ্গে সুসম্পর্ক করি, আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে। সবার সঙ্গে সদাচার করি; সালাম-কালাম বিনিময় করি।

রমজানের তৃতীয় জুমুআর আলোচনা

রমজানের শেষ দশক: গুরুত্ব ও আমল

সমস্ত প্রশংসা মহান রবের জন্য যিনি আমাদেরকে রমজান পর্যন্ত হায়াত দিলেন এবং একে একে রমজানের তৃতীয় জুমুআ আদায় করার লক্ষ্যে আজ মসজিদে সমবেত হওয়ার তাওফিক করে দিলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি একক; তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসুল। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার প্রতি, তার পরিবাবর্গের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার সকল অনুসারীদের প্রতি। যিনি রমজানের শেষ দশকে জাগ্রত থেকে ইবাদত পালনের মাধ্যমে তার উম্মতকে এক চমৎকার আদর্শ শিখিয়ে গিয়েছেন। আম্মা বা'দ

প্রিয় হাজেরিন!

মহান রব তাঁর বান্দাদের জন্য পুরো বছরে বেশ কিছু বোনাসের ব্যবস্থা রেখেছেন। মাকসাদ হলো– এসব বোনাস অর্জনের মাধ্যমে বান্দাহ যেন তার আমলের একাউন্টকে সমৃদ্ধ করে এবং অন্য নবিদের উম্মতের উপর প্রাধান্য লাভ করে। যেমন: আরাফা দিবস, মুহার্‌রম দিবস, লাইলাতুল কদর, শবে বারাত, জিলহজ মাসের প্রথম দশক, রমজানের শেষ দশক। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ বোনাস হলো– রমজানের শেষ দশক। যদিও রমজানের পুরো মাসটিই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক মহিমান্বিত মাস এবং এর প্রতিটি দিন ও প্রতিটি মুহূর্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন হাদিসে রমজানের প্রথম দু'দশকের চেয়ে শেষ দশকের আলাদা বৈশিষ্ট্য ও ফজিলতের কথা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে রমজানের শেষ দশকের মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণগুলো আলোকপাত করা হল:

শেষ দশকের বিশেষ ফজিলতের কারণ

১. এ দশকের প্রতি রাসুলুল্লাহর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান

অন্যান্য রাতের তুলনায় এ দশকের রাতগুলোকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

"রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে এত বেশি ইবাদত করতেন যা অন্য দশকে করতেন না" (সহিহ মুসলিম: ২৮৪৫)।

এমনকি তিনি কোমর বেঁধে পুরো রাত ইবাদত করতেন। আয়েশা রা. বলেন,

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْلِطُ الْعِشْرِينَ بِصَلاَةٍ وَنَوْمٍ فَإِذَا كَانَ الْعَشْرُ شَمَّرَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.

"রমজানের প্রথম বিশ দিন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাত্রিতে) নিদ্রা ও সালাতের সংমিশ্রণ ঘটাতেন কিন্তু শেষ দশকে কাপড় গুটাতেন এবং লুঙ্গি/পায়জামা শক্ত করে বাঁধতেন" (মুসনাদ আহমাদ: ২৩৯৮৩)।

২. রাসুলুল্লাহ নিজে পুরো রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকদের জাগাতেন

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

"রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে লুঙ্গি শক্ত করে বাধতেন, নিজে রাত জাগতেন এবং স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন" (সহিহ বুখারি: ২০২৪; সহিহ মুসলিম: ২৮৪৪)। পরিবারের লোকদের জাগাতেন কারণ, প্রতিটি মানুষ নিজের আমলের সাথে সাথে পরিবারের লোকদের আমলের ব্যাপারেও দায়িত্বপ্রাপ্ত। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে" (সহিহ বুখারি: ৭১৩৮; সহিহ মুসলিম: ৪৮২৮)। পরিবারের লোকদের বাদ দিয়ে শুধু নিজে আমল করে মুক্তি পাওয়া কঠিন। বিশেষ করে পরিবারের যারা অভিভাবক বা নেতা তাদের ব্যাপারে এ দায়িত্বভারটি আরো গভীরভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক ঈমানদারের উচিত নিজে আমল করার সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকে আমল করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। মহান আল্লাহ মু'মিন বান্দাদের সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۞

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদেরকে এবং তোমাদের পরিবারের সদস্যদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হলো মানুষ ও পাথর" (সুরা তাহরীম ৬৬: ৬)।

কাজেই আমাদেরকে নিজের আমলের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের আমলের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। অভিভাবকদের অসতর্কতার কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কোনো পাপে লিপ্ত হলে এর দায়ভার পরিবারের অভিভাবকের ওপরও বর্তাবে।

৩. কুরআন নাজিলের দশক

কুরআন নাজিলের ব্যাপারে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞

"নিশ্চয় আমি এটি নাজিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী" (সুরা দুখান ৪৪: ৩)।

সুরা কদরে বলা হয়েছে,

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞

"নিশ্চয়ই আমি এটি নাজিল করেছি 'লাইলাতুল কদরে" (সুরা কদর ৯৭: ১)।

আগের আয়াতে বলা হয়েছে বরকতময় রাতে কুরআন নাজিল করেছি। আর এ আয়াতে বলা হয়েছে, কদরের রাতে কুরআন নাজিল করেছি। আবার সুরা বাকারায় বলা হয়েছে, (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) "রমজান মাসে কুরআন নাজিল করা হয়েছে" (আয়াত: ১৮৫)। এ থেকে জানা যায়, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হেরা গুহায় যে রাতে আল্লাহর ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রমজান মাসের একটি রাত। এই রাতকেই বরকতময় রাত ও কদরের রাত বলা হয়েছে। আর সেটি ছিল রমজানের ২৫-এর রাত যা এ দশকের মধ্যে রয়েছে। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা নবিগণের প্রতি যত কিতাব নাজিল করেছেন, তা সবই রমজান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাজিল হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সহিফাসমূহ রমজানের ১ম তারিখে, তাওরাত ৬ তারিখে, যাবুর ১২ তারিখে, ইঞ্জিল ১৮ তারিখে এবং কুরআন ২৪ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর (পঁচিশের রাতে) অবতীর্ণ হয়েছে" (মুসনাদে আহমাদ: ৪/১০৭)।

৪. কদরের রাতবিশিষ্ট দশক

এ দশক বাকী দু'দশক থেকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো, এ শেষ দশকে রয়েছে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন রাত তথা কদরের রাত যা হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর এ লাইলাতুল কদর এমন এক মহিমান্বিত রাত যাকে কেন্দ্র করে

গোটা সৃষ্টিজগত খুশিতে, গৌরবে আল্লাহ প্রেমের সাগরে অবগাহন করে। এ হচ্ছে পৃথিবী ও ঊর্ধ্ব জগতের মহামিলনের রাত। সারা বিশ্ববাসীর জন্য এ রাত হচ্ছে সবচেয়ে আনন্দদায়ক রাত, যার মত এত মর্যাদাপূর্ণ রাত পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে অদ্যাবধি শুধু উম্মতে মুহাম্মদী ছাড়া অন্য কোনো উম্মতকে দেয়া হয়নি। এ রাতে সারা বিশ্বে হেদায়াতের যে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় তা ইতোপূর্বে অন্য কোনো ধর্মের লোকেরা কোনোদিন দেখতে পায়নি। নিম্নে লাইলাতুল কদরের বিভিন্ন দিকগুলো আলোকপাত করা হলো:

লাইলাতুল কদরের নামকরণ: কদরের রাতের নামকরণে ইসলামি পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। ক) কদর অর্থ সম্মান। এ রাতটি যেহেতু অন্যান্য সকল রাতের তুলনায় সম্মানিত তাই একে লাইলাতুল কদর বলা হয়। খ) কদর অর্থ ভাগ্য। যেহেতু এ রাতে চলতি বছরের প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ও ভাগ্যের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেহেতু একে লাইলাতুল কদর বা ভাগ্র রজনী বলা হয়। আল্লাহ বলেন, (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) "সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়" (সুরা দুখান ৪৪: ৪)। গ) কদর অর্থ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বা ফাকা পুরিপূর্ণ হয়ে যাওয়া। এ রাতে এতো অধিক সংখ্যক ফেরেশতা অবতরণ করেন যে, দুনিয়ার জায়গাগুলো সংকীর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

লাইলাতুল কদরের ফজিলত: এ রাতের মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য একটি কথাই যথেষ্ট যে, উম্মতে মুহাম্মদীর পূর্বে অন্য কোনো নবির উম্মতকে এ ধরনের মহিমান্বিত রাত প্রদান করা হয়নি যাকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআনের পূর্ণ একটি সুরা অবতীর্ণ হয়েছে। এ রজনীর ফজিলতগুলো নিম্নে অতি সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

ক. কুরআন নাজিলের রাত: সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন দুই পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) "নিশ্চয় আমি তা (কুরআন) নাজিল করেছি 'লায়লাতুল কদরে" (সুরা কদর ৯৭: ১)।

খ. বরকতময় রাত: এ রাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অসংখ্য বরকত ও রহমত দুনিয়াবাসীর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়। মহান আল্লাহ নিজেই এ রাতকে বরকতময় রাত বলে অভিহিত করছেন। তিনি বলেন, (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ) "নিশ্চয় আমি তা(কুরআন) অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রাত্রিতে। আমিই তো সতর্ককারী" (সুরা দুখান ৪৪: ৩)।

গ. শ্রেষ্ঠতম রাত: পৃথিবীর বুকে কদরের এ রাতটি শ্রেষ্ঠতম রাত। আল্লাহর ভাষায় এ রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিরাশি বছর চার মাসের চেয়েও এর মূল্য বেশি। এক হাজার মাস ইবাদত করলে যে সওয়াব হবে এ এক রাতের ইবাদত তার চেয়ে অধিক উত্তম। এ কারণেই এ রাতটি ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম রাত। দয়াময় আল্লাহ বলেন, (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ) "লায়লাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম" (সুরা কদর ৯৭: ৩)। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوْمٌ) "তাতে একটি রাত রয়েছে যা হাজার মাসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এ রাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে সম্পূর্ণ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো। আর এর কল্যাণ থেকে শুধুমাত্র বঞ্চিতরাই বঞ্চিত হয়" (সুনান ইবন মাজাহ: ১৬৪৪)। এখানে হাজার মাস দ্বারা বিশেষ একটি সীমাবদ্ধ সময়ের অর্থ বোঝানো হয়নি। বরং আধিক্য বোঝানোর জন্যই এ সময়টির উল্লেখ হয়েছে। এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে, বান্দার জীবনে এ রাতটি হাজার হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

ঘ. ফেরেশতা ও রূহ অবতরণের রাত: মর্যাদাসম্পন্ন এ রাতের প্রথম ভাগ থেকে শেষ ভাগ পর্যন্ত ঊর্ধ্বজগত ও পৃথিবীর মাঝখানে ফেরেশতাগণ ও রূহ (মহান আত্মা বা জিবরিল আ.)-এর আলোর ছটা পরিব্যাপ্ত হয়। তাঁরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে রহমত, অনুগ্রহ, কল্যাণ ও সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে যমীনে অবতরণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, (تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) "সে রাতে ফেরেশতাকুল ও রূহ (জিবরিল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে" (সুরা কদর ৯৭: ৪)।

ঙ. শান্তির রাত: লাইলাতুল কদর এমন এক রাত যাতে বর্ষিত হয় শান্তির নূর যা সারা বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে এবং সকল সৃষ্টির ধমনীতে প্রবাহিত হয়। আর শান্তির এ সমুজ্জ্বল জ্যোতি প্রভাতের দেদীপ্যমান আলো উদিত না হওয়া পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত থাকে। এ শান্তিই হচ্ছে লাইলাতুল কদরের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন, (سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) "শান্তি, সেই রজনী ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত" (সুরা কদর ৯৭: ৫)।

চ. পাপ থেকে মুক্তিলাভের রাত: কদরের রাতটিও পাপ থেকে ক্ষমা লাভের জন্য অন্যতম একটি রাত। নবি করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (مَنْ

(قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) "যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে সালাত আদায় করবে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে" (সহিহ বুখারি: ১৯০১)।

ছ. প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়/ভাগ্য নির্ধারণের রাত: লাইলাতুল কদরে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, (فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) "এ রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত করা হয়" (সুরা দুখান ৪৪: ৪)। আল্লামা মাহমূদ আব্দুল লতীফ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "পরবর্তী বছরের জন্য প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় ও মহৎ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এ লাইলাতুল কদরে নেয়া হয়। কাজেই আমাদের রবের নিকট এটি ভাগ্য রজনী যাতে মানুষের বিষয়াদি নির্ধারণ করা হয়। এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, লাইলাতুল কদরের মর্যাদা অনেক উচ্চ ও মহৎ" (আল-জামিউ লিআহকামিস সিয়াম, মুহমুদ আব্দুল লতিফ, পৃষ্ঠা: ২৮৫)।

লাইলাতুল কদর কখন

গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী এ দশকেই রয়েছে কদরের রাত। কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, লাইলাতুল-কদর রমজান মাসে। তবে কোন রাতটি কদরের রাত তা নিয়ে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌছে। এ-সব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, লাইলাতুল-কদর রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে; কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই; বরং যে কোন রাত্রিতে হতে পারে। আবার প্রত্যেক রমজানে তা পরিবর্তিতও হতে পারে। তবে এ মতগুলোর মধ্যে তিনটি মতের পক্ষে অধিকাংশ আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন। মত তিনটি হলো:

এক. রমজানের শেষ দশকের যে কোনো রাত: তারা তাদের মতের পক্ষে দলীল দেন যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন, (كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) "রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন এবং বলতেন, তোমরা রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করো" (সহিহ বুখারি: ২০২০; সহিহ মুসলিম: ২৮৩৩)।

দুই. রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ)

مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) "তোমরা রমজানের শেষ দশকে বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত্রি অন্বেষণ কর" (সহিহ বুখারি: ২০১৭)।

তিন. রমজানের ২৭তম রাত্রি লাইলাতুল কদর। এ মতের পক্ষে যারা তারা উবাই ইবন কা'ব রা. হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেন, তিনি বলেন, (هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ هِيَ الَّتِي أَخْبَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْضَاءَ تَرْقُرَقُ) "তা (লাইলাতুল কদর) রমজানের ২৭তম রাত, সে সম্পর্কেই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সেদিনসূর্য উদয় হবে আলোকিত হয়ে কিন্তু তাতে কোনো প্রকার রশ্মি ও কিরণ থাকবে না" (মুসনাদ আহমাদ: ২১১৯১)। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, (إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ أُبَيٌّ وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ وَاللهِ إِنِّي لاَعْلَمُ ... أَيُّ لَيْلَةٍ هِيَ؟ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ صَبِيحَةِ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ) "আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, যে ব্যক্তি পুরো বছর সালাত আদায় করবে সে লাইলাতুল কদর পাবে। তখন উবাই রা. বলেন, ঐ আল্লাহর কসম যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই লাইলাতুল কদর রমজান মাসেই ...। আল্লাহর কসম, আমি জানি সেটি কোন রাত্রি। তা সেই রাত্রি যে রাত্রিতে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছিলেন। তা রমজানের ২৭তম রাত" (সহিহ মুসলিম: ১৮২১)।

সবচেয়ে নিরাপদ মত: এ তিনটি মতের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সবচেয়ে নিরাপদ মত হলো প্রথম মতটি। অর্থাৎ শেষ দশকের প্রতি রাতকে লাইলাতুল কদর মনে করে ইবাদত করা। কেননা, এতে কোনো রিস্ক থাকে না। বাকি বেজোড় রাতে বা কেবলমাত্র ২৭তম রজনীতে ইবাদত করলে রিস্ক থেকে যায় যে, যদি তা জোড় রাতে হয়ে থাকে। তাই, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও সচেতন মু'মিনের উচিত শেষ দশকের প্রতি রাতকে লাইলাতুল কদর মনে করে ইবাদত করা। আর এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকের প্রতি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন এবং পরিবারের লোকদের জাগিয়ে দিতেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

৫. ইতিকাফবিশিষ্ট দশক

রমজান মাসের শেষ দশকের ইবাদতগুলোর মধ্যে ইতিকাফ অন্যতম একটি ইবাদত। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইতিকাফ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও ইতিকাফ করেন। এমনকি রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বেই ইতিকাফের বিধান প্রচলিত ছিল। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۞

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈল থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, তারা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু' ও সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র করবে" (সুরা বাকারা ২: ১২৫)। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

"নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাফ করেন" (সহিহ বুখারি: ২০২৬; সহিহ মুসলিম: ২৮৪১)।

এমনকি তিনি কোনো বছর কোনো কারণে ইতিকাফ করতে না পারলে পরবর্তী বছর তা আদায় করে নিতেন। উবাই ইবন কা'ব রা. বলেন–

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً.

"নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর ইতিকাফ করতে পারেননি। অতঃপর যখন পরবর্তী বছর আসলো, তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করলেন" (সহিহ বুখারি: ২০২৬; সহিহ মুসলিম: ২৮৪১)। মাহমূদ আব্দুল লতীফ বলেন, "এ হাদিসগুলো থেকে আমরা এ বিষয়টি পাই যে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রমজানের শেষ দশকে নিয়মিত ইতিকাফ করতেন। কিন্তু এক বছর সফরের কারণে ইতিকাফ করতে না পারায় পরবর্তী বছর তার পরিবর্তে ১০ দিন এবং এ বছরের ১০ দিন মোট বিশ দিন ইতিকাফ করেন। তার এসব আমল ইতিকাফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝায় যে, তা

আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অন্যতম একটি ইবাদত" (আল-জামিউ লিআহকামিস সিয়াম, মুহমুদ আব্দুল লতীফ, পৃষ্ঠা: ৩২৭)।

ইতিকাফের উপকারিতা

- **আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি:** ইতিকাফের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। বান্দা দুনিয়াবী সকল কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। ফলে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক গাঢ় হয়।

- **পাপমুক্ত থাকার অভ্যাস:** ইতিকাফের মাধ্যমে বান্দার মাঝে অহেতুক কথা, কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে সংযত থাকার অভ্যাস গড়ে ওঠে। ফলে সে পরবর্তী জীবনেও নিজেকে এসব অশণ্টীল ও অহেতুক কাজ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

- **মসজিদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি:** দুনিয়াতে সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ। ইতিকাফের মাধ্যমে দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান মসজিদের সাথে বান্দার সম্পর্ক তাজা হয় ও মসজিদে অবস্থানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। যে সমস্ত বান্দাদের সম্পর্ক মসজিদের সাথে তৈরী হয় তারা কিয়াতের উত্তপ্ত মুহূর্তে যখন সূর্য একেবারে কাছে চলে আসবে তখন আল্লাহর ছায়াতলে আশ্রয় পাবে। রাসুলুল্লাহ স. বলেন–

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ...

"সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তার আরশের ছায়াতলে ছায়া প্রদান করবেন যেদিন তার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ ইমাম, এমন যুবক যে তার রবের ইবাদতে জীবন ব্যয় করেছে এবং এমন লোক যার অন্তর মসজিদের সাথে সংযুক্ত..." (সহিহ বুখারি: ৬৬০)।

- **চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জিত হয়:** ইতিকাফকারী দুনিয়াবী ব্যস্ততা থেকে দূরে অবস্থান করে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয়। বদ অভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে ইতিকাফের মাধ্যমে চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়।

কখন ইতিকাফে প্রবেশ করবে

যিনি রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফের নিয়্যাত করেছেন, তার জন্য বিশ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বেই ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করা উত্তম। ইমাম আহমাদ ছাড়া বাকী তিন

ইমাম সাহেবদের এটিই মত। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি নিজের ওপর কোনো মাসের ইতিকাফ আবশ্যক করে নেয় সে সূর্যাস্তের আগেই ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করবে এবং মাসের শেষ তারিখে সূর্যাস্তের পরই মসজিদ থেকে বের হবে" (আলউম্ম, মুহাম্মদ ইবন ইদরীস আশ-শাফিঈ: ২/১১৫)। তাছাড়া ইতিকাফের মূল লক্ষ্য লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান, যা শেষ দশকের বে-জোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর একুশতম রাত এরই অন্তর্ভুক্ত। তবে ফজরের নামাযান্তেও ইতিকাফে প্রবেশ করা যেতে পারে। এ মর্মে আয়েশা রা. থেকে একটি হাদিস বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

যেসব কাজ থেকে ইতিকাফকারী বিরত থাকবে

১. এমন সকল নেক আমল বা ইবাদত-বন্দেগির জন্য বের হওয়া যাবে না যা তার জন্য অপরিহার্য নয়। যেমন রোগির সেবা করা, জানাযাতে অংশ নেয়া ইত্যাদি। আয়েশা রা. বলেন–

السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا.

"ইতিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হলো, সে রোগিকে দেখতে যাবে না বা সেবা করতে যাবে না, জানাযায় অংশগ্রহণ করবে না, নারীকে স্পর্শ করবে না এবং তার সাথে সহবাসেও লিপ্ত হবে না" (সুনান আবু দাউদ: ২৪৭৫)। তবে হ্যাঁ, জানাযা যদি একই মসজিদে হয় তবে তাতে শরিক হওয়া যাবে। অনুরূপ রোগি যদি মসজিদের ভেতরে থাকে তবে তার সেবা করা বা খোঁজ-খবর নেয়া যাবে।

২. এমন সকল কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে না যা ইতিকাফবিরোধী। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, চাষাবাদ ইত্যাদি। ইতিকাফ অবস্থায় মসজিদের ভিতরে বা বাহিরে কোথায়ও ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। ইতিকাফ অবস্থায় এ সকল কাজের জন্য মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ বাতিল হয়ে যায়।

৩. অতিরিক্ত কথা ও ঘুম, অহেতুক কাজে সময় নষ্ট করা, মানুষের সাথে বেশি বেশি মেলা-মেশা ইত্যাদি ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে। তাই এ সব থেকে ইতিকাফকারী বিরত থাকবে।

৪. কামভাবসহ স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন ইতিকাফে থাকাকালীন কোনো অবস্থাতেই অনুমোদিত নয়, তা বরং সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন:

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ

"তোমরা মসজিদসমূহে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে কামভাবে লিপ্ত হয়ো না" (সুরা বাকারা ২: ১৮৭)। আয়েশা রা. বর্ণিত রয়েছে (وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً وَلاَ يُبَاشِرَهَا) "ইতিকাফকারী নারীকে স্পর্শ করবে না এবং তার সাথে কামভাবে লিপ্ত হবে না" (সুনান আবু দাউদ: ২৪৭৫)।

৫. বায়ু নিঃসরণ মসজিদের আদবের পরিপন্থী। তাই পারতপক্ষে একাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। তবে রোগ হলে ভিন্ন কথা।

ইতিকাফ থেকে বের হওয়া

ঈদের চাঁদ দেখা গেলে সে রাতে ইতিকাফ থেকে বেরিয়ে পড়া বৈধ। তবে ইসলামি পণ্ডিতগণের কারো কারো মতে ঈদের চাঁদ যে রাতে দেখা যাবে সে রাত মসজিদে অবস্থান করে মসজিদ থেকেই ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করা উত্তম।

ইতিকাফরত অবস্থায় অসুস্থ হলে তার বিধান

কোনো ব্যক্তি ইতিকাফে থাকাবস্থায় যদি অসুস্থ হয়ে যায় যে, তাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া লাগবে বা তার চিকিৎসার জন্য বারবার হাসপাতালে যাওয়া লাগবে তবে সে তাৎক্ষণিক ইতিকাফ ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসা করাবে। পরে যদি সুযোগ হয় তবে তা আদায় করে নিবে। আর আদায় করতে না পারলে তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সে যদি মানতের ইতিকাফকারী হয় তবে সে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা নিবে এবং পরে অবশ্যই তাকে তার মানত পূরণ করতে হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ.

"যে আল্লাহর অনুকরণমূলক কাজের মানত করে সে যেন তা পূরণ করে" (সহিহ বুখারি: ৬৬৯৬)।

সুতরাং যাদের সুযোগ রয়েছে তাদের উচিত ইতিকাফ পালনের মাধ্যমে নিজকে সকল মানুষ ও পাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে নিজকে মগ্ন করে লাইলাতুল কদর অর্জনের মাধ্যমে হাজার মাসের অধিক ইবাদতের সওয়াব লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সুযোগ লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন!!

৬. এ দশক রমজানের শেষ দশক

প্রবাদ আছে যে, যার শেষ ভাল তো তার সব ভাল। রমজানের শেষ দশক হল রমজান মাসের শেষ অংশ। আর এ অংশে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশি

বেশি ইবাদত ও তাতে চেষ্টা করা মূলত এ মাসের উত্তম সমাপ্তিরই ইঙ্গিত করে। রমজান মাসের সমাপ্তি যাতে উত্তমভাবে হয় সে জন্য এ দশকের যথেষ্ট গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا) "নিশ্চয়ই আমলসমূহ (এর ফলাফল) তার সমাপ্তির ভিত্তিতেই হয়" (সহিহ বুখারি: ৬৪৯৩)। অর্থাৎ সমাপ্তি যদি ভাল হয় তবে এর ফলাফলও ভাল হয় আর সমাপ্তি যদি ভাল না হয় তবে এর ফলাফলও ভাল হয় না।

শেষ দশক বা কদরের রাতের আমলসমূহ

শেষ দশকের রাতগুলোতে কদরের রাত পাওয়ার আশায় আমরা যেসব ইবদাত করতে পারি তা হলো–

১. রমজানের সাধারণ আমলগুলো এই দশকে আরও বেশি গুরুত্বের সঙ্গে সম্পাদন করা। কোমর বেঁধে ইবাদতে মশগুল হওয়া বা ইবাদতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে ইবাদতের জন্য অধিক পরিমাণ সাধনা করা।

২. ইতিকাফ করা।

৩. ইবাদতের জন্য নিজে রাত্রিজাগরণ করা। পরিবারের সদস্যদের রাত্রিজাগরণে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া। নবি কারিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) "যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় রাত জেগে ইবাদত করে, তাঁর পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে" (সহিহ বুখারি: ১৯০১)।

৫. রাতে তারাবির নামাজ পড়া। শেষ দশকের তারাবি নামাজ যেন কোনোভাবেই না ছুটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বিষেশ করে ২৭ রমজানের পর যখন কুরআন খতম হয়ে যায় তখনও যেন প্রতিদিন তারাবির সালাত আদায় করে নেই।

৬. শেষ রাতে সাহরির আগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া। তাহাজ্জুদের নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর রমজান মাসে এর গুরুত্ব আরো অনেক বেড়ে যায়। তাই রমজান মাসের প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করা। বিশেষ করে শেষ দশকের প্রতি রাতে। রমজান সেহরি খেতে উঠার কারণে তাহাজ্জুদ আদায়ের সহজ সুযোগ তৈরি হয়। তা কাজে লাগানো।

৭. কুরআন তিলাওয়াত করা। কেবলমাত্র শেষ দশকের রাতগুলোতে কদরের রাত পাওয়ার মাকসাদে এক বা একাধিক খতম দেয়া এবং কুরআন বুঝে পড়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা।

৮. বেশি বেশি দরূদ শরিফ পড়া।

৯. তওবাহ-ইসতেগফার ও দোয়া করা। সাইয়্যেদুল ইসতেগফার বা হাদিসে বর্ণিত ইসতেগফার পড়া। এক বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রা. বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি জানতে পারি যে, কোনটি কদরের রাত্রি তবে আমি তাতে কি দোয়া করবো? তিনি বললেন, তুমি বল, (اللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওউন কারীমুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'অফু আন্নী" অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, উদার, ক্ষমা পছন্দ করেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন (সুনান তিরমিযী: ৩৫১৩)।

১০. জিকির-আজকার করা।

১১. পরিবার পরিজন, বাবা-মা ও মৃতদের জন্য দোয়া করা।

১২. বেশি বেশি দান-সদকা করা।

১৩. ঈদের চাঁদ অনুসন্ধান করা ও চাঁদ দেখার দোয়া পড়া।

১৪. সাদকাতুল ফিতর আদায় করা।

তবে খেয়াল রাখতে হবে সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা অবশ্যই জরুরি।

পরিসমাপ্তি

মহান আল্লাহ পৃথিবীর সৃষ্টলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত বহু জাতি-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছেন। আবার তাদের রঙ, শক্তি, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ প্রভৃতি ছিল ভিন্নতর। তারা বয়সও পেয়েছে উম্মতে মুহাম্মদীর চেয়ে অনেক বেশি। ফলে তারা অনেক বেশি ইবাদত করতে পারত। নুহ নবির ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন, তিনি ৯৫০ বছর দীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু তার উম্মত তার এ দাওয়াতে সাড়া দেয়নি। তাঁর বাণী,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۞

"আর আমি নূহকে তার কাওমের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মাঝে ৯৫০ বছর অবস্থান করে। অতঃপর তার উম্মতকে তুফান আক্রমন করলো, কারণ তারা ছিল যালিম" (সুরা আনকাবূত ২৯: ১৪)।

তাদের সেই আয়ুর তুলনায় উম্মতে মুহাম্মদীর গড় আয়ু কিছুই নয়। কারণ উম্মতে মুহাম্মদীর গড় আয়ু হল, ৬০ ও ৭০-এর মাঝামাঝি। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ.

"আমার উম্মতের বয়স ষাট ও সত্তরের মাঝামাঝি। তাদের কম সংখ্যক লোকই এ সীমা অতিক্রম করে" (সুনান তিরমিযি: ৩৫৫০)।

উম্মতে মুহাম্মদী তাদের এ স্বল্প আয়ুতে যাতে অল্প ইবাদতের মাধ্যমে অনেক মর্যাদা ও সওয়াব লাভ করতে পারে সেজন্য দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য বিভিন্ন মর্যাদাসম্পন্ন মাস, রাত ও দিন প্রদান করেছেন যেগুলোতে ইবাদত করে বান্দা বেশি আয়ুর সওয়াব ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। লাইলাতুল কদর সে মর্যাদাসম্পন্ন রাতগুলোর অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ যা এ দশকের মধ্যেই রয়েছে। এ রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম যা বছরের হিসেবে ৮৩ বছরের চেয়ে বেশি।

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির উচিত এ অত্যন্ত গৌরবময় এবং দুর্লভ সুযোগ যেন হাতছাড়া না হয় সে লক্ষ্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করা এবং অত্যধিক বিশ্বস্ততা এবং ধ্যানের মাধ্যমে রমজানের শেষ দশকের রাতগুলো অতিবাহিত করা এবং লাইলাতুল কদর অর্জনের চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ রাত অর্জন এবং এ রাতে ইবাদতে মগ্ন থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন!

রমজানের চতুর্থ জুমুআর আলোচনা

মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধির জন্য রমজানের শিক্ষা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র জগতের রব। যিনি মানুষকে মহব্বত করে, দয়া করে তাদের জন্য দ্বীনকে সহজ করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া আর কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসুল। যিনি আল্লাহর দ্বীনকে সহজভাবে মানুষের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন। দরুদ ও সালাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবগ এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত তার অনুসারীদের প্রতি। আম্মা বা'দ,

প্রিয় উপস্থিতি!

আজ আমরা রমজানের চতুর্থ জুমুআ তথা শেষ জুমুআ আদায় করার জন্য মসজিদে সমবেত হয়েছি। যেই মহান আল্লাহ তাঁর অগণিত বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে আমাদেরকে এ নেক কাজের জন্য নির্বাচন করলেন এবং যথাসময়ে মসিজদের আসার তাওফিক দিলেন সেই রবের শাহি দরবারে কালমাতুশ শুকর আদায় করে আমরা সকলে বলি, 'আলহামদু লিল্লাহ'।

প্রিয় হাজেরিন!

দেখতে দেখতে রমজান মাসের বিদায় নেয়ার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ আমরা ২৭ তম রোজা উদযাপন করছি। তারাবি, তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত ও ইতেকাফসহ মাসব্যাপী রোজা পালন ও ক্ষমা প্রার্থনায় তাওবা-ইসতেগফারের মধ্য দিয়ে রমজান মাস অতিবাহিত করতে যাচ্ছি। রমজানের পুরো মাসটি হলো প্রশিক্ষণের মাস। এ মাস আধ্যাত্মিক বিকাশ, আত্ম-প্রতিফলন এবং ব্যক্তিগত রূপান্তরের জন্য গভীর সুযোগ প্রদান করে। রোজা এবং নামাজের আচার-অনুষ্ঠানের বাইরে, রমজান মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধির জন্য অমূল্য শিক্ষা প্রদান করে। আল্লাহ তাআলা প্রতি বছর রমজান পাঠান যাতে আমরা ধার্মিক হতে পারি। এটি কেনো আচার বা উৎসব হিসেবে আসে না; বরং এটি জীবন পরিবর্তনকারী হিসেবে আসে। অতএব, আমাদের অবশ্যই রমজানের পরে কী করতে হবে তা শিখতে হবে এবং পবিত্র মাসটি শেষ হওয়ার পরেও সৎকর্ম চালিয়ে যেতে হবে।

এ মাসে রোজাদার রোজা পালনের মাধ্যমে স্বীয় পাপাচার ও যাবতীয় গুনাহকে পরম ধৈর্য, সংযম ও আত্মশুদ্ধির অনলকুণ্ডে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। পাশাপাশি এ মাসটি পরম স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাসী সত্যনিষ্ঠ মানুষজনের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, মানবিক ও আদর্শিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের এক প্রকৃষ্ট সময়সীমা। রমজানে প্রকৃত মানুষ ও তার উদার-মানস গঠনের ক্ষেত্রে রোজাদার ব্যক্তি যে প্রশিক্ষণের সুযোগ পান তা অনন্য ও বৈচিত্র্যময়। মানুষকে নির্লোভ, নিঃস্বার্থ, অমায়িক, সহনশীল, দয়াবান, ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী, অধ্যাবসায়ী, মনোবলসম্পন্ন, দৃঢ়চিত্ত, সহিষ্ণু ও সংযমী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রমজানের প্রশিক্ষণ অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। পার্থিব সব কাজের বেলায় কর্ম-সাফল্যের তাগিদে প্রশিক্ষণ এক অবধারিত বিষয়। সত্যনিষ্ঠ রোজাদারের জন্য মাহে রমজান এক অভিনব প্রশিক্ষণের নাম। সুতরাং সুদীর্ঘ ৩০ দিন রমজান আমাদের যেসব প্রশিক্ষণ দিল তা বাকি জীবনে ধরে রাখার প্রত্যয় আমাদের করতে হবে। তবেই কেবলমাত্র এ রমজান আমাদের জীবনে সফলতা নিয়ে আসতে পারবে। রমজান আমাদের যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করল বড় দাগে সেগুলোকে আমরা নিম্নবর্ণিত পয়েন্টে উপস্থাপন করতে পারি।

১. সহমর্মিতা ও দান-অনুদানের শিক্ষা

মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসকে 'শাহরুল মুওয়াসাত' তথা 'সহমর্মিতার মাস' বলে আখ্যায়িত করেছেন। রমজানের এক মাসের রোজা আমাদের মাঝে অন্যের দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথা-বেদনা বোঝার অনুভূতি সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সময় উপবাসের মাধ্যমে ক্ষুধার কি জ্বালা তা মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দেয়। ধনাঢ্য ব্যক্তি যখন রোজা রাখেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন, উপবাস থাকার যন্ত্রণা কত কষ্টদায়ক! তখন তিনি দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মী হন। রমজানের পরে বাকি সময়ও যেন আমরা সহমর্মী হই, সে শিক্ষাই রমজানের রোজা আমাদের দেয়। এ কারণেই সর্বদা দানশীল হওয়া সত্ত্বেও রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানে অধিক পরিমাণে দান করতেন। আমরা রমজানের দ্বিতীয় জেনেছিলাম যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ».

"আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল রমজানে তিনি আরো অধিক দানশীল হতেন, যখন জিবরিল আ. তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। আর রমজানের প্রতি রাতেই জিবরিল আ. তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং তাঁরা একে অপরকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমতের বায়ু অপেক্ষাও অধিক দানশীল ছিলেন" (সহিহ বুখারি: ৬; সহিহ মুসলিম: ৩২০৮)।

মুসলিম উম্মাহর পূর্বসূরিরা একে অপরের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে স্বীয় ভাইদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজের অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্রপীড়িত ছিলেন। এটাই মূলত: উত্তম দান। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সবচেয়ে উত্তম সাদাকাহ হচ্ছে, কষ্টে অর্জিত অল্প সম্পদ থেকে দান করা" (আবু দাউদ: ১৬৭৭)। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সম্পর্কে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

۞

"আর তারা তাদের নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়; নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যাদের অন্তর কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম" (সুরা হাশর ৫৯: ৯)। সুতরাং আমরাও রমজান থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁদের অনুসৃত পথে চলার চেষ্টা করব।

২. ডিসিপ্লিন বা নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা

মানুষকে শৃঙ্খলিত জীবনের দিকে পথ-নির্দেশ করে রমজান মাস। রমজান এলেই রোজাদার সময়মত সেহরি খায়, সময়মত জামাআতে নামাজ আদায় করে, সময়মত মসজিদে উপস্থিত হয়, সময়মত ইফতার করে, সময়মতা তারাবিহ পড়ে। সময়মত শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করে। আবার অন্যান্য সময়ের মত নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজগুলোও করে। তাই একজন মানুষ যদি রমজান মাসকে অনুসরণ করে, তবে বাস্তবজীবনে একজন সফল নিয়মতান্ত্রিক মানুষে পরিণত হতে পারবে সে। আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন আলী রা. থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেন,

«مَنْ أَتَى عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ صَحِيحًا مُسْلِمًا، صَامَ نَهَارَهُ، وَصَلَّى وِرْدًا مِنْ لَيْلِهِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ، وَحَفِظَ فَرْجَهُ وَلِسَانَهُ وَيَدَهُ، وَحَافَظَ عَلَى صَلَاتِهِ مَجْمُوعَةً، وَبَكَّرَ إِلَى جُمُعِهِ، فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ، وَاسْتَكْمَلَ الْأَجْرَ، وَأَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَفَازَ بِجَائِزَةِ الرَّبِّ».

"যে ব্যক্তি সুস্থ ও মুসলিম অবস্থায় রমজান পেয়ে দিনের বেলায় সওম পালন করল, রাতের বেলায় নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করল, চক্ষু অবনমিত রাখল, নিজের লজ্জাস্থান, জবান ও হাত হেফাজত করল, জামাআতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করল ও খুব তাড়াতাড়ি জুমুআর সালাতে গেল, তাহলে সে যথাযথভাবে রোজা পালন করল, পুরোপুরি সাওয়াব প্রাপ্ত হবে, লাইলাতুল কদর লাভ করবে এবং তার রবের পুরস্কার প্রাপ্ত হয়ে সফলকাম হবে" (ফাদায়েলু রমজান, ইবন আবীদ দুনিয়া, পৃ. ৪৮)।

৩. আত্ম-শৃঙ্খলা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা

ইসলামী শরিয়ত অন্যদের প্রতি সদাচরণ এবং শ্রদ্ধা অনুশীলনের শিক্ষা দেয়। রমজান কেবল খাবার থেকে বিরত থাকার বিষয়ে নয়; এটি স্বার্থপরতা এবং লোভ থেকে বিরত থাকার এবং আত্ম-শৃঙ্খলা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব উপলব্ধি করার বিষয়েও। রমজানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির মধ্যে একটি হল খারাপ কথাবার্তা এবং কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। দীর্ঘ এক মাসের এ আমলে তা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। পাশাপাশি সওম পালন আমাদেরকে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, যৌন-আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-বিলাস পরিহার করে আত্মসংযমের মাধ্যমে এক আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। আঘাতেই প্রতিঘাতের জন্ম। রোজা আমাদের আঘাত করতে বারণ করে। শিক্ষা দেয় সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের। রোজা শেখায়, কেউ তোমাকে আঘাত করলেই তুমি তাকে প্রতিঘাত কর না; সংযমী হও। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

«وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ. فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ».

"তোমাদের কেউ যেন রোজা পালনের দিন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার" (সহিহ বুখারি: ১৯০৪)।এ শিক্ষা যদি আমরা সারা জীবনের জন্য নিজেদের মাঝে ধারণ করি, তাহলে সমাজ হবে নির্মল, হানাহানি ও বিদ্বেষমুক্ত।

৪. পরিশ্রমী ও কর্মঠ হওয়ার শিক্ষা

রোজা মানুষকে অলসতামুক্ত হয়ে পরিশ্রমী হতে শেখায়। প্রত্যেক রোজাদার দিনের বেলায় পানাহার ত্যাগ করা সত্ত্বেও নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগির পাশাপাশি

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে। সারা দিন রোজা রেখে রাতের বেলায় তারাবিহ-তাহাজ্জুদ নামাজ আদয়, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার করে। এতকিছুর পরও আবার শেষ রাতে ওঠে সেহরি খাওয়া এবং ফজর নামাজ আদায় করা অনেক কষ্টকর। তারপরও সে সামান্যতম অলসতা করে না। সকালে সামান্য বিশ্রাম নেয়ার পর জীবিকার তাগিদে আবার কর্মস্থলে বের হয়ে যায়। রমজান মাসের এসব কঠিন পরিশ্রম মানুষকে পরিশ্রমী হতে শেখায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ».

"শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিনের চাইতে উত্তম এবং আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। অবশ্য উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করো এবং আল্লাহর সাহায্য চাও এবং কখনও অক্ষমতা প্রকাশ করো না" (সহিহ মুসলিম ২৬৬৪; মুসনাদ আহমাদ: ৮৫৭৩, ৮৬১১)। ইতোপূর্বে আমরা জেনেছি যে, রমজানের শেষ দশকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন এবং কোমড় বেঁধে ইবাদতে মগ্ন হয়ে যেতেন। নিজে পুরো রাত জাগতেন এবং পরিবারের লোকদেরকেও জাগাতেন ও ইবাদত করার নির্দেশ দিতেন। এসবই কঠোর পরিশ্রমী ও কর্মঠ হওয়ার শিক্ষা প্রদান করে।

৫. পরকালমুখী জীবনযাপনের প্রশিক্ষণ

পরকাল মানবজীবনের শেষ ঠিকানা। পরকাল অনন্ত, শাশ্বত। মানুষের জীবনের মূল সফলতা পরকালীন সফলতা। পরকালে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে ও অনন্ত সুখের জান্নাতে প্রবেশের অধিকার পাবে, সেই হবে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী (সুরা আলু ইমরান: ১৮৫)। তবে এই জান্নাতে প্রবেশের অধিকার আদৌ কোনো সহজ বিষয় নয়। তা বরং অতি মূল্যবান ও শ্রমসাধ্য এক বিষয়। পরকালের সুখের জান্নাত সেই পাবে যে ব্যক্তিই পৃথিবীতে সতর্ক হয়ে জীবনযাপন করবে। যা কিছু ব্যক্তির নিজের জন্য ক্ষতিকর, পরিবারের জন্য ক্ষতিকর, সমাজের জন্য ক্ষতিকর, দেশের জন্য ক্ষতিকর, এক কথায় যা কিছু মানব অস্তিত্বের জন্য ক্ষতিকর তা পরিহার করবে। ইসলাম সব ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। তবে প্রশ্ন হলো, একজন মানুষ কীভাবে সব নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকতে পারে। উত্তর হলো, সিয়াম সাধনার সময় মানুষকে বৈধ বিষয় থেকেও বিরত রাখা হয়। বৈধ বিষয় থেকে বিরত থাকা শেখা হয়ে গেলে অবৈধ ও

নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা সহজ হয়ে যায়। রমজানের পর অবশিষ্ট ১১ মাস সব ক্ষতিকর বিষয় থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। মহানবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য অনুযায়ী, শুধু খাদ্য ও পানীয় থেকে বিরত থাকাটাই রোজার সর্বোচ্চ উৎকর্ষ স্পর্শ করার জন্য যথেষ্ট নয়, রোজার উৎকর্ষ স্পর্শ করতে হলে বরং সংবরণ করতে হবে জিহ্বাকেও। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

"যে ব্যাক্তি মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করেনি, তাঁর এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই" (সহিহ বুখারি: ১৯০৩)।

এর অর্থ সিয়াম সাধনার মূল শিক্ষা হলো সব কর্মকে পরিশুদ্ধ করা। সব ক্ষতিকর কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। কেননা পরকালের জগৎ মিথ্যামুক্ত জগৎ। পরকালের জগৎ অপকর্মমুক্ত নির্মল এক সুখের জগৎ। অতএব সব অপকর্ম, সব মিথ্যা থেকে বিরত ও মুক্ত হতে হবে। সিয়াম সাধনা এ ক্ষেত্রে মানুষকে দারুণভাবে সহায়তা করে। পরকালমুখিতার অনুভূতি তীব্র করার জন্য মাহে রমজানের শেষ ১০ দিন নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ করে রাখার তথা ইতিকাফের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এ দিনগুলোয় রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। আমাদেরও উচিত বস্তুজগতের মায়া মোহের বাঁধন ছিঁড়ে তাকওয়ামুখী হৃদয় অর্জন করা।

৬. তাকওয়া অর্জনের শিক্ষা

রোজার প্রধান শিক্ষাই হল তাকওয়া অর্জনের শিক্ষা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۞

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর" (সুরা বাকারা ২: ১৮৩)।

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর; যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার" (সুরা বাকারা: ১৮৩)। তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা ও ভয় করা। পরিভাষায় মহান আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ও পাপাচার হতে

বিরত থাকাকে তাকওয়া বলে। আর দীর্ঘ এক মাস প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বান্দাকে তাকওয়া অবলম্বন করার যোগ্যতা তৈরি করেন মহান আল্লাহ।

তাকওয়া অর্জন করা ছাড়া মু'মিনদের উপায়ও নেই। কারণ, (اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ) "আল্লাহ শুধুমাত্র মুত্তাকিদের ইবাদত কবুল করেন" (সুরা মায়েদা: ২৭)। অতএব, বাকি ১১ মাস যদি আল্লাহর কাছে আমরা মুত্তাকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারি, রমজানের প্রশিক্ষণ তাহলেই সুফল দেবে। রোজা আমাদের অন্তরে আল্লাহভীতি তৈরি করে। তাই গোপন জায়গায় থাকার পরও আমরা পানাহার থেকে বিরত থাকি। রোজার এই একটিমাত্র শিক্ষা আমাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন, এই অনুভূতি সর্বদা আমাদের জাগ্রত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۞

"আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা (সুরা হাদিদ ৫৭: ৪)।

৭. কুরআনের আলোকে জীবন গড়ার শিক্ষা

কুরআন নাজিলের মাস রমজান। বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষা ও কুরআনের সমাজ গড়া রমজানের অন্যতম শিক্ষা। মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি কুরআন চর্চা করেন পবিত্র রমজানে। রমজান ও কুরআনের উদ্দেশ্যও এক। ইবনে হাজার রহ. বলেন, "কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মিক উপস্থিতি ও উপলব্ধি" (ফাতহুল বারি: ৯/৪৫)। ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, "রাসুলের কুরআন শিক্ষা ও অনুশীলনের একমাত্র কারণ ছিল পরকালের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুল ভাবনার জাগরণ এবং পার্থিব বিষয়ে অনীহার সৃষ্টি করা" (ইবনে বাত্তাল, শরহে বুখারি: ১/১৩)।

হাশরের ময়দানে বান্দার মুক্তির জন্য রোজা ও কুরআনের ভূমিকা থাকবে বেশি। নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , يَقُولُ الصِّيَامُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ , وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ».

"কুরআন ও রোজা আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ করবে। রোজা বলবে, 'আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও মনের খায়েশাত মিটানো থেকে বিরত রেখেছিলাম'। কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব আমাদের সুপারিশ কবুল করুন'। তখন আল্লাহ তাআলা সুপারিশ কবুল করে নিবেন" (মুসনাদে আহমদ: ৬৬২৬)। অপর এক বর্ণনায় আবু উমামা আল বাহিলি রা. এর সূত্রে বর্ণিত, নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ».

"তোমরা কুরআন পড়, কেননা তিলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআন সুপারিশকারী হিসেবে আসবে" (সহিহ মুসলিম: ৮০৪)।

৮. পরনিন্দা পরিহারের শিক্ষা

রোজা আমাদের পরনিন্দা, গিবত-শেকায়েত থেকে বিরত থাকতে শেখায়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهُ. قِيلَ: وَبِمَ يَخْرِقُهُ؟ قَالَ: بِكَذِبٍ. أَوْ غِيبَةٍ».

"রোজা হল ঢাল, যে পর্যন্ত না তাকে বিদীর্ণ করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কীভাবে রোজা বিদীর্ণ হয়ে যায়? রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মিথ্যা বলার দ্বারা অথবা গিবত করার দ্বারা'" (শুআবুল ঈমান, তবারানি: ৪৫৩৬)। গিবত বা পরনিন্দা সবসময়ই নিন্দনীয় ও মহাপাপ। তাই শুধু রমজানেই নয়, সারা জীবনের জন্য তা পরিত্যাগ করতে হবে। এ শিক্ষাই রোজা আমাদের দেয়।

৯. ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের শিক্ষা

সব মুসলমানের ওপর রোজা ফরজ। চাই সে বাদশা হোক কিংবা ফকির, কালো হোক কিংবা সাদা, খাটো হোক কিংবা লম্বা। সবাই একসঙ্গে রোজা রাখবে, একসঙ্গে তারাবি পড়বে, এটাই ইসলামের চাওয়া এবং রোজার শিক্ষা। আর ঘটেও তাই। ফলে ধনী-গরিবের মাঝে তৈরি হয় ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতা। তা ছাড়া ধনী-গরিবের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরির জন্য রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর আবশ্যক করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ. وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ».

"রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকাতুল ফিতর অবধারিত করেছেন অশ্লীল কথা ও অর্থহীন কাজ হতে মাহে রমজানের রোজাকে পবিত্র করার জন্য এবং গরিব-মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য" (সুনান আবু দাউদ: ১৬০৯)। রমজানে একই দস্তরখানে সম্মিলিতভাবে ইফতার করা এবং যাকাত ও সদকাতুল ফিতর প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন তৈরি হয়। এই ভ্রাতৃত্ববোধ মুসলিমদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার একান্ত অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ। ইরশাদ হয়েছে, (وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا) "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" (সুরা আলু ইমরান ৩: ১০৩)।

১০. ধৈর্য ধারণের শিক্ষা

হাদিসে রমজান মাসকে 'শাহরুস সবর' বা 'ধৈর্যের মাস' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সারাদিনের প্রচণ্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও ক্ষুধা নিবারণে ইফতারের অপেক্ষায় সবর করে রোজাদার। রূপসী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দিনে বেলা সহবাস করেন না। এমনকি আচার-আচরণেও ধৈর্যধারণ করেন। রোজাদার চাইলেই লুকিয়ে পানাহার করতে পারে; আল্লাহর ভয়ই তাকে লুকিয়ে খাওয়া বা পান করা থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানকে সবর তথা ধৈর্যের মাস বলেছেন। আনন্দ, বেদনা, দুঃখ ও উদ্বেগ ইত্যাদি সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে আল্লাহ ও তার রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় ধৈর্য বলে। উপবাস থাকার কারণে রোজাদার ব্যক্তির অনেক কষ্ট হয়। এর ওপর তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। এভাবে পূর্ণ এক মাস তাকে প্রস্তুত করা হয়। যেন রোজার পরেও সে এ শিক্ষা ধরে রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۞

"হে মু'মিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন" (সুরা বাকারা ২: ১৫৩)। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

"যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করবেন। আর ধৈর্য অপেক্ষা অধিক উত্তম ও কল্যাণকর বস্তু আর কিছুই কাউকে

দেয়া হয়নি" (সহিহ বুখারি: ১৪৬৯)। ধৈর্যধারণকারীর সাফল্য সুনিশ্চিত, কারণ আল্লাহ তাআলা ধৈর্য ধারণকারীর সঙ্গে থাকেন। তাই মু'মিন মুসলমানের উচিত, রমজানের ধৈর্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যেন পুনরায় পরের মাসগুলোতে ধৈর্য হারা না হন।

১১. অনর্থক ও অহেতুক কাজ বর্জনের শিক্ষা

রোজা রাখার কারণে আমরা এ মাসে অনেক বেহুদা ও অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকি যা অন্য মাসগুলোতে আমরা করে থাকি। রোজা দীর্ঘ একমাস আমাদেরকে অনর্থক কাজ ও কথা থেকে বিরত রাখে। শরিয়তের দাবি হলো– অনর্থক কথা-কাজ মু'মিনের জন্য শোভনীয় নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সফল মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে ঘোষণা করেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۞

"আর যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে" (সুরা মু'মিনুন ২৩: ৩)। পূর্ণ মু'মিনের এটি দ্বিতীয় গুণঃ অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা। 'লাগউন' এর অর্থ অসার ও অনর্থক কথা বা কাজ। এর মানে এমন প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যা অপ্রয়োজনীয়, অর্থহীন ও যাতে কোনো ফল লাভও হয় না। যেমন: শিরক, গোনাহের কাজ, গান-বাজনা ইত্যাদি (তাফসিরে ইবন কাসীর; তাফসিরে কুরতুবি)। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ».

"ব্যক্তির জন্য ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হল অর্থহীন কথা বা কাজ ত্যাগ করা" (সুনান তিরমিযি: ২৩১৭)।

মোটকথা, যাতে কোন দ্বীনী উপকার নেই বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। এ কারণেই শরিয়তে একে কামেল মু'মিনদের বিশেষ গুণ এবং ইসলামের সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াত ও হাদিসের পূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ঈমানদারেরা বাজে কথায় কান দেয় না এবং বাজে কাজের দিকে দৃষ্টি ফেরায় না। সে ব্যাপারে কোনো প্রকার কৌতুহল প্রকাশ করে না। যেখানে এ ধরনের কথাবার্তা হতে থাকে অথবা এ ধরনের কাজ চলতে থাকে। সেখানে যাওয়া থেকে দূরে থাকে। তাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত হয় আর যদি কোথাও তার সাথে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে তাকে উপেক্ষা করে, এড়িয়ে চলে যায় অথবা অন্ততপক্ষে তা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। একথাটিকেই অন্য জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে,

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۞

"আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য হয় না এবং যখন এমন কোনো জায়গা দিয়ে তারা চলে যেখানে বাজে কথা হতে থাকে অথবা বাজে কাজের মহড়া চলে তখন তারা ভদ্রভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায়" (সুরা ফুরকান ২৫: ৭২)। অর্থাৎ আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা জেনে শুনে আজে-বাজে কথা ও কাজ দেখতে বা শুনতে অথবা তাতে অংশ গ্রহণ করে না। আর যদি কখনো তাদের পথে এমন কোন জিনিস এসে যায়, তাহলে তার প্রতি একটা উড়ো নজর না দিয়েও তারা এভাবে সে জায়গা অতিক্রম করে যেমন একজন অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ময়লার স্তুপ অতিক্রম করে চলে যায় (তাফসিরে ফাতহুল কাদির; তাফসিরে কুরতুবি)।

এ ছাড়াও মু'মিন হয় একজন শান্ত-সমাহিত ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী এবং পবিত্র-পরিচ্ছন্ন স্বভাব ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষ। বেহুদাপনা তার মেজাজের সাথে কোন রকমেই খাপ খায় না। সে ফলদায়ক কথা বলতে পারে, কিন্তু আজেবাজে গল্প-গুজব তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে ব্যাঙ্গ, কৌতুক ও হালকা পরিহাস পর্যন্ত করতে পারে। কিন্তু উচ্ছল ঠাট্টা-তামাসায় মেতে উঠতে পারে না, বাজে ঠাট্টা-মস্করা ও ভাড়ামি বরদাশত করতে পারে না এবং আনন্দ-ফুর্তি ও ভাড়ামির কথাবার্তাকে নিজের পেশায় পরিণত করতে পারে না।

১২. একনিষ্ঠতা লাভের শিক্ষা

রোজা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মানুষ রেখে থাকে। কেননা মানুষ চাইলে লোকচক্ষুর অন্তরালে পানাহার করতে পারে; কিন্তু তা করে না। সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। এটাকেই ইখলাস বলে। আর আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইখলাস পূর্বশর্ত। রোজা আমাদের এই ইখলাস অর্জন করতে শেখায়। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

«الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي».

"রোজা আমার জন্যই, আর আমিই এর প্রতিদান দেব। যেহেতু সে আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার প্রবৃত্তি, পান ও আহার ত্যাগ করেছে" (সহিহ বুখারি: ৭৪৯২)।

ইবাদত হবে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে; মানুষের প্রশংসা বা পার্থিব সুবিধা-চিন্তা এতে থাকতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ مَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ ؕ

"আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে; তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দ্বীন" (সুরা বাইয়িনা ৯৮: ৫)।

তাই ইবাদতে ইখলাস তথা নিষ্ঠার শিক্ষাকে পরবর্তী **১১** মাস কাজে লাগাবেন একজন প্রকৃত মুসলিম।

১৩. রোজা পালনের শিক্ষা

রমজানে আমরা ফরজ রোজা রেখে থাকি। ফরজ রোজা ছাড়াও আরো বিভিন্ন প্রকারের রোজা রয়েছে। যেমনঃ ওয়াজিব রোজা, সুন্নত রোজা, নফল রোজা ইত্যাদি। রমজান মাসে ফরজ রোজা রাখার মাধ্যমে বাকি **১১** মাসে নফল ও সুন্নত রোজা রাখার শিক্ষা অর্জিত হয়।

১৪. নিয়মিত নামাযি হওয়ার শিক্ষা

রমজানের আগেও যে মানুষটি নামাজ পড়তেই অলসতা করত কিংবা ঠিকভাবে নামাজ পড়ত না। রমজান মাসে সেই মানুষটিই নিজে নামাজ পড়ে এবং অপরকেও নামাজের আহ্বান করে। যা আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ। এ কারণেই রমজান এলে মানুষ মসজিদমুখী হয়। মসজিদ ফিরে পায় প্রকৃত যৌবন। নামাজের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে রোজাদার। এ সবই রমজানের রোজার আলোকিত শিক্ষা। যা পরেও মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হতে থাকে।

১৫. তাহাজ্জুদ পালনের শিক্ষা

'তাহাজ্জুদ' শব্দের অর্থ কষ্ট-ক্লেশ, শ্রম-পরিশ্রম। সন্ধ্যারাতে ঘুমিয়ে মধ্যরাতের পর শয্যাত্যাগ করাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। তাহাজ্জুদ নামাজের সময় রাতের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তথা রাত দুইটার পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার আগপর্যন্ত। সেহরির সময় শেষ হলে তথা ফজরের ওয়াক্ত শুরু হলে তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত শেষ হয়। তাই তাহাজ্জুদের আগে ঘুমানো এবং ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম। প্রিয় নবিজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতেই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। নফলের মধ্যে তাহাজ্জুদ সর্বোৎকৃষ্ট আমল। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ».

"ফরজ নামাজগুলোর পর উত্তম নামাজ হল তাহাজ্জুদ" (সহিহ মুসলিম: ১১৬৩)। আলী রা. বলেছেন, "যাঁরা রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়েছেন, তাঁরাই আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ঊর্ধ্বারোহণ করেছেন" (দিওয়ানে আলী, নাহজুল বালাগা)। তাহাজ্জুদ হল মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মোক্ষম মাধ্যম।

রমজান মাসে ফরজ রোজা পালনের নিমিত্তে সেহরি খাওয়ার সুন্নত আদায়ের জন্য উঠতে হয় এবং সেহরির সময়ই হল তাহাজ্জুদের সময়। সুতরাং রমজানে তাহাজ্জুদ আদায় করা খুবই সহজ। তাহাজ্জুদ ২ রাকাত করে ৮ রাকাত, ১২ রাকাত বা আরো কম বা বেশিও পড়া যায়। রমজানের নফলের সওয়াব ফরজের সমান, ফরজের সওয়াব ৭০ গুণ। তাই রমজানে তাহাজ্জুদের সহজ ও সুবর্ণ সুযোগ প্রায় সকলেই কাজে লাগিয়ে থাকি। এভাবে আমরা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হয়।

১৬. পরিমিত ঘুমানোর শিক্ষা

রমজানে মানুষ রোজা রাখা, নিয়মিত কাজগুলো যথাযথ সম্পন্ন করা এবং বেশি বেশি ইবাদত করার কারণে অতিরিক্ত ঘুমাতে পারে না। তাই রমজানে পরিমিত পরিমাণে সে ঘুমিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে পরিমিত ঘুমানোর প্রশিক্ষণ লাভ করে।

১৭. দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা

রমজানের রোজা একজন রোজাদারকে সব অন্যায়, জুলুম, অত্যাচার নির্যাতনমূলক কাজকর্ম করা থেকে বিরত রাখে। পরিবার ও সমাজে যাতে কোনো গর্হিত কাজ না হয় সে ব্যাপারেও সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। রোজাদার কাজকর্মে, অফিস-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সব জায়গায় নিজেকে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রাখে যা রমজান ব্যতীত অন্য সময় সচারচর দেখা যায় না। এর মাধ্যমে রোজাদার বাকি ১১ মাস রমজানের দায়িত্বশীল হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণে আলোকিত জীবন-যাপন করতে পারে।

উপসংহার: এভাবে রমজানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ দ্বারা নিজেদের একজন সৎ ও খোদাভীরু নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। মাহে রমজানের এ শিক্ষা যদি বাকি ১১ মাস কাজে লাগানো যায়, তাহলে পৃথিবীতে এত অশান্তি ও অনাচার থাকতে পারে না। যেমনভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "যে সংশোধিত হল, সেই সফলকাম হল" (সুরা আ'লা: ১৪)। রমজানের পরে ইবাদত-বন্দেগী কিছু কমে যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে ইচ্ছাকৃত পাপের পথে ফিরে যাওয়া যাবে না। তাহলে রমজানের সকল পরিশ্রম বাতিল করে দেয়া হল। নিজের কষ্টে

অর্জিত কর্ম বাতিল করে দেয়ার মত বোকামি ও পাগলামি আর কিছুই হতে পারে না। মুসলিম এক মনীষী বলেন, "সেসব ব্যক্তিবর্গ কতই না মন্দ, যারা রমজান ছাড়া আল্লাহকে চিনে না"। যদি কেউ মনে করে, রমজান মাসে ইবাদত করাই যথেষ্ট তাহলে তাদের ভাবনা অসঙ্গত ও ভুল। কারণ, আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۞

"মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর" (সুরা হিজর ১৫: ৯৯)।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা যদি আমাদের কর্তব্য কাজে তৎপর হতে পারি এবং রমজান ও সওমের শিক্ষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি তবে আমাদের এ জীবন অর্থবহ ও সার্থক হবে। কাজেই আমাদের উচিত পবিত্র রমজানের শিক্ষা থেকে উপরোক্ত গুণাবলী অর্জন করা এবং জীবনে ধারণ করে আলোকিত মানুষ হওয়ার এবং আলোকিত সমাজ গড়ার চেষ্টা করা।

রমজানের পর অনুশীলনের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য:

১. নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত এবং বোঝার জন্য মানসম্পন্ন সময় দিন।

২. আর্থিক এবং অ-আর্থিক উভয় ধরনের সদকার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করুন; সৎকর্মের একটি তালিকা রাখুন।

৩. অ-আর্থিক সদকার তালিকা: স্বাস্থ্য সংকটে সহায়তা করুন। শিক্ষা সহায়তা প্রদান করুন। চাকরির সুযোগ প্রদান করুন। অন্যদের অনুপ্রাণিত করুন এবং ধৈর্য ও সৎকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ভাগাভাগি করুন।

৪. আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় তাঁর নৈকট্য অর্জন করুন এবং আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুশীলনের প্রতি মনোযোগ দিন।

৫. পরিবারের সদস্যদের কুরআনের বার্তা বুঝতে এবং নির্দেশনা অনুশীলন করতে অনুপ্রাণিত করুন।

৬. পরিবারের সদস্য বা প্রতিবেশীদের একটি দলের সাথে সংযুক্ত থাকুন এবং রমজানের শিক্ষা এবং কুরআনের নির্দেশনা আমরা কতটা সর্বোত্তমভাবে বাস্তবায়ন করছি সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানার একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তাওফিক দান করুন। আমিন!

নিষ্ঠার সাথে নামাজের ফজিলত

নামাজ মানবজাতির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর সর্বশ্রেষ্ট উপহার। নামাজের মাধ্যমে বান্দার সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক তৈরি হয়। কুরআনে আল্লাহ বলেন "তোমরা ধৈর্য ধরো এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো" (সুরা বাকারা: ৪৫)। নামাজ মানুষকে সবর করতে শেখায় এবং এই ইবাদত নফসের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার ঢাল। মানুষের দুর্বলতা এবং অসহায়ত্বের ঢাল হিসেবে নামাজকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল ইবাদতের মধ্যে নামাজ সবচাইতে সহজ, কিন্তু ওজনে অনেক ভারী। নামাজ এমনি একটি ইবাদত যা ধনী-গরীব, সুস্থ, অসুস্থ এবং স্থান-কাল-এর ওপর নির্ভরশীল নয়। যেকোনো পরিস্থিতিতে বান্দা আল্লাহর কাছে পৌছাতে পারে আত্মসমর্পণের এর মাধ্যমে। সিজদায় বান্দা আল্লাহর সবচাইতে কাছে পৌঁছায়।

নামাজ কিভাবে পড়লে বান্দার উপকার হবে সেব্যপারে আল্লাহর উপদেশ কুরআনে পরিষ্কার। বান্দা কার সামনে হাজির হচ্ছে সেব্যাপারে সচেতনতা প্রথম শর্ত। কুরআনে ঘোষণা হচ্ছে "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে বিশ্বাসীরা, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়নম্র, আর যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান" (সুরা মু'মিনুন: ০১)। সুতরাং, বান্দার কাছে নামাজের উপকার তখনই দৃশ্যমান হবে, যখন সে নিষ্ঠার সাথে নামাজ আদায় করবে এবং সষ্টিকর্তার কাছে তার মনের আবেগ নিয়ে অসহায়ত্বের প্রকাশ করে হালকা হবে।

নামাজ এর অপর নাম প্রার্থনা। পুরো নামাজ জুড়েই প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহার মাধ্যমে, সরল সঠিক পথের সন্ধান এবং সহজ জীবনের আকুতি। একমাত্র তিনিই পারেন তা মঞ্জুর করতে। নামাজে নিষ্ঠাবান হলে, উদাসীন না হলে, বান্দারই বেশি লাভ। বিপদে-আপদে প্রথমেই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে হাজির হলে, বান্দার অন্তরের কথা আল্লাহ কবুল করে নেন। যখন বান্দার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক তৈরী হয় তখন "ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাইন" (সুরা ফাতিহা: ০৪) সার্থকতা পায়।

কুরআনে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি, নামাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা অনেক বার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'আকিমুস সালাত' বা নামাজকে প্রতিষ্ঠা করা বলতে মূলত নামাজের

মুল উদ্দেশ্যকে কে প্রতিষ্ঠা বোঝায়, যা কিনা নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা, এবং কুরআনের উপদেশ কে জীবনে পালন করাকেই বোঝানো হয়েছে। কেউ যদি নামাজে নিষ্ঠাবান হতে চায়, তবে নামাজে কুরআনের যতটুকু আয়াত সে পড়ে, তা যদি বুঝতে পারে, তবেই মনোযোগ ও নিষ্ঠার জায়গাটা মজবুত হবে। সুরা ফাতিহার অর্থ যদি কেউ জানে এবং প্রতি রাকাতে তা মনোনিবেশ করতে পারে, তবে সুরা ফাতিহার মর্মবানী তার জীবনে পালন করার অর্থই হবে নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। এক অর্থে কুরআনের উপদেশকে নিজের জীবনে এবং পরিবারে পালন করাকেই নামাজ প্রতিষ্ঠা বোঝানো হয়।

নামাজ প্রতিষ্ঠার অন্য একটি মাত্রা হলো, জীবনে নামাজের গুরুত্বকে পরিবারে অনুপ্রেরণা দেয়া। কুরআনে এ ব্যাপারে নির্দেশ হলো "তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাজের উপদেশ দাও এবং সে ব্যাপারে অবিচলিত থাকো" (সুরা ত্বহাঃ ১৩২)। নামাজ পড়লে আমাদের লাভ- নামাজ সবর আনে, মনের শান্তি দেয়, রিজিকের প্রসারতা আনে, এবং ঈমান মজবুত করে।

নামাজের মাধ্যমে দোয়া কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে নামাজ সুরক্ষা করা এবং নামাজে যত্নবান হওয়া। নামাজ কেবল শুধু দায়িত্ব নয় বরং হৃদয়ের প্রশান্তি ও স্বস্তির মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নামাজকে আমার চোখের শীতলতা করা হয়েছে" (সুনান নাসায়িঃ ৩৯৩৯), যার অর্থ হচ্ছে আধ্যাত্মিক শান্তি এবং আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তির পরিতৃপ্তি। নামাজের মাধ্যমে জীবনে ইতিবাচক প্রভাবের প্রতিফলন হয় মানুষের আচরণে, বিপদে বিশ্বাসের শক্তিতে, ধৈর্য ধারণে এবং ভালো কাজের উৎসাহ পাওয়ার মধ্যে। নামাজ ভুল-ত্রুটির স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পথ দেখায়, এবং অসীম ক্ষমতার স্রষ্টার কাছে জীবনের কঠিন পরীক্ষা মোকাবিলার সাহস ও শক্তি যোগায়।

কুরআনের আয়াতে
দোয়া ও আত্মশুদ্ধির পরিচয়

আল-কুরআনে দোয়া বা প্রার্থনাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের প্রধান মাধ্যম হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর পটভূমি হিসেবে কুরআনে মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য হিসেবে "তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম" (সুরা মুলক: ০২) এবং "তারা আমারই ইবাদত করবে" (সুরা জারিআত: ৫৬)। এই দুই মাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে কুরআনে মানুষের জন্মগত বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে এভাবে যে "মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে" (সুরা নিসা: ২৮) এবং "মানুষের মন তো মন্দ কর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার ওপর আমার প্রতিপালক দয়া করেন" (সুরা ইউসুফ: ৫৩)। প্রতিনিয়ত নফসের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য এবং আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে প্রতিপালকের হেদায়েত অর্জনের জন্য দোয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

দোয়ার মাধ্যমে মনের প্রশান্তি লাভ হয়, বান্দা চলার পথে শক্তি পায়, ধৈর্য ধারণ কওে এবং তাকওয়া মজবুত হয়। দোয়ার মাধ্যমে বান্দা তার আবেগ নিয়ে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে, বিপথ থেকে ফিরে আসার জন্য তওবা করে এবং সত্যনিষ্ঠ পথে অবিচল থাকার শক্তি চায়।

যদিও আল্লাহ মানুষের সকল অবস্থা সম্পর্কে সর্বজ্ঞানী "আলিমুল গায়েব" এবং সব শোনেন সব দেখেন "আস সামি আল বাসির" তবুও বান্দার কাছ থেকে তার অবস্থা শুনতে তিনি ভালবাসেন। প্রতিনিয়ত বান্দা যে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় সেই পরীক্ষার হেদায়েত এর জন্য বান্দার আকুতি তিনি পছন্দ করেন। তার সৃষ্টির তার প্রতি আনুগত্য এবং ইবাদতই তার রব হিসেবে স্বীকৃতি। কুরআনে আল্লাহ আশ্বস্ত করেন "আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তওসমূহ শান্তি পায়" (সুরা রা'দ: ২৮)।

বান্দা তার অভাব অভিযোগ নিয়ে হাজির হয় তার কাছে, যে তাকে "ফা ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা" (নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে) (সুরা শরহ: ৫) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ভরসার জায়গা মজবুত করার জন্য বান্দার জন্য দোয়া একটি বিশ্বস্ত আশ্রয়স্থল। যেখানে সবকিছু বলা যায়, নিজের কষ্টের আকুতি প্রকাশ করা যায়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়, এবং মনের প্রশান্ত নিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়।

দোয়ার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে, সঠিক পথের হেদায়েত চেয়ে, বান্দা "ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাইন" (সুরা ফাতিহা: ৪) এর প্রতিশ্রুতি কে সুরক্ষা করে।

দোয়া হল মু'মিনের হাতিয়ার, যা তাকে আল্লাহর রহমত ও বরকতের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ কুরআনে বারবার আমাদের দোয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যদি তারা আন্তরিকভাবে তাঁকে ডাকে, তবে তিনি তাদের ডাকে সাড়া দেবেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দোয়া শিখিয়েছেন, যা তাঁর বান্দারা বিভিন্ন সময়ে করতে পারে। এই দোয়াগুলো আমাদের ইবাদত, জীবন পরিচালনা এবং আখিরাতের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আমাদের আত্মশুদ্ধি, ধৈর্য্য, ও ক্ষমার জন্য অত্যন্ত কার্যকর দোয়া। এই দোয়াগুলোর মাধ্যমে আমরা পার্থিব ও পরকালীন কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে পারি।

কুরআন বিভিন্ন নবি-রাসুলদের দোয়া বর্ণনা করেছে, নবিরা করেছেন, আল্লাহ পছন্দ করেছেন এবং কবুল করেছেন। সুতরাং, দোয়া করি আল্লাহর কাছে রাসুল এবং প্রিয় বান্দারা যে দোয়া করেছেন তা আল্লাহ আমাদের শিখিয়েছেন কুরআন এর মাধ্যমে।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে, দোয়া কবুল হওয়ার জন্য, সততা-নিষ্ঠার পাশাপাশি, সুনির্দিষ্ট কিছু সময়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিদিন আর রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের নামাজে সিজদার সময়ে, প্রতি সপ্তাহে জুম্মার দিন আসর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে, প্রতি বছর রমজানে কদরের রাতে এবং প্রতি বছর হজ্জের সময়ে আরাফাতের দিনে।

সুরা ফাতিহা

কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া

কুরআন এর সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সুরার নাম সুরা ফাতিহা। এই সুরাটি আল কুরআন-এর প্রারম্ভিকা হিসাবে রাখা হয়েছে বলে এর নাম সুরা ফাতিহা। সুরা ফাতিহার অনেকগুলো নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উম্মুল কিতাব এবং আসাসুল কুরআন, যার অর্থ সম্পূর্ণ কুরআনের সারাংশ এই সুরায় কেন্দ্রীভূত। বরকতময় এই সুরা আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্কের মূল প্রতিফলন। সুরা ফাতিহা একমাত্র সুরা যা নামাজের প্রতি রাকাতে পরিপূর্ণভাবে পড়ার নিয়ম বাধ্যতামূলক। সুরা ফাতিহার কাঠামো আল্লাহর শেখানো প্রার্থনা হিসাবে দুইভাগে সাজানো হয়েছে। প্রথম ভাগে আল্লাহর প্রশংসা ও পরিচয়। দ্বিতীয় ভাগে আল্লাহর কাছে বান্দার আবেদন।

সাত আয়াতের সুরা ফাতিহা শুরু হয় 'আলহামদুলিল্লা হি রব্বিল আল-আমীন' দিয়ে- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি হচ্ছেন 'রব'। আর 'রব' হলো যিনি সৃষ্টি করেন, সামঞ্জস্য করেন এবং হেদায়েত করেন। আর যিনি এই প্রশংসার যোগ্য তার পরিচয় হচ্ছে 'আর রাহমানির রাহীম'- পরম করুণাময় ও অসীম দয়াময়। আল্লাহ এর পরে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন যে তিনি 'বিচারদিনের মালিক'। একদিকে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ, অন্যদিকে ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতার প্রতিশ্রুতি- এর মাঝেই আল্লাহর পরিচয় গভীরভাবে নিহিত।

সুরা ফাতিহার মধ্যে একটি অসাধারণ ভারসাম্য লক্ষণীয়। সুরা ফাতিহার প্রথম অংশ হচ্ছে "ইয়া কানা বুদু" এর মূল ফাউন্ডেশন এবং পরের অংশ হচ্ছে "ওয়া ইয়া কানাস্তাইন" এর ব্যাখ্যা। "ইয়া কানা বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাইন" এর আগে যে তিনটি আয়াত আছে, তার মাধ্যমে আল্লাহ যে একমাত্র ইবাদতের যোগ্য তাকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। একমাত্র আল্লাহ কে ইবাদতের যোগ্য করার প্রথম স্বীকৃতি হচ্ছে তিনি সবকিছুর প্রতিপালক রাব্বুল আল-আমীন, দ্বিতীয় স্বীকৃতি হচ্ছে তিনি রহমানুর রাহীম-পরম করুণাময় ও দয়ালু। তৃতীয় স্বীকৃতি হচ্ছে তিনি বিচার দিনের মালিক। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আস্থা, এবং ভয় এই তিনের ওপর ভিত্তি করেই ইবাদতের অঙ্গীকার। "ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস তাঈন"– এর অর্থ, একমাত্র

তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। এই এবাদাত হচ্ছে অবিচল বিশ্বাস, ধৈর্য্য এবং সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

এই মূল ভিত্তির ওপর বিশ্বাস রেখে আমরা বলি "ওয়া ইয়া কানাস্তাইন", একমাত্র আপানারই কাছে সাহায্য চাই। আল্লাহর কাছেই সরাসরি চাইতে হবে এবং কোনো মাধ্যম লাগবে না- এটাই লা ইলাহার মূল ভিত্তি। কি সাহায্য লাগবে এবং, কোন পথে সাহায্য আসবে, তা আল্লাহ শেষের অংশে বুঝায় বললেন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। এখানে "ইহদিনা" বলতে "আমাদেরকে হেদায়েত দেন", পথ দেখান। হেদায়েত চাই কিসের জন্য-"সিরাতুল মুসতাকিম" মানে হলো "সঠিক পথটা চিনিয়ে দিন, এই পথে পরিচালিত করুন, পথটা সহজ করে দিন, এবং অবিচল থাকার তৌফিক ও মনোবল চাই"। বান্দা কতটুকু মনযোগী হয়ে "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম" বলছে তাহাও একটা হিদায়েত। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়ে যারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন, সেই পথের আবেদন করে, এরপর আমরা বলি "সিরাতাল্লাজিনা আন আমতা আলাইহিম"। সুরা নিসায় আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারা হচ্ছে নবীগন, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ এবং সৎকর্মপরায়ণ।

কুরআনে আল্লাহ বলেন, সরল সঠিক পথ দেখানোর মালিক তিনিই। আমাদের সঠিক পথের আবেদনের পরপরই সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেন, "এই সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সাবধানিদের জন্য এ পথপ্রদর্শক"। সঠিক পথ আল্লাহ কাকে দেখাবেন, সুরা মায়িদায় বলেন, "যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, এ (কুরআন) দিয়ে তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, আর নিজের ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান, আর ওদেরকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেন"।

নামাজের মূল ইসেন্স বা উপযোগিতা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বান্দার দোয়া। "ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম" হচ্ছে সবচাইতে বড় বাধ্যতামূলক দোয়া। নামাজের মধ্যে "ইয়া কানা বুদু" এর ওপর আনুগত্য এবং "সিরাতাল মুস্তাকিম" এর মধ্যে অসহায়ত্বের আকুলতা নিয়ে বান্দা হাজির হয়। নামাজের মধ্যে যখন অসহায়ত্বের আকুতি নিয়ে আমরা ভেঙ্গে পড়ি, এই প্রকাশের মাধ্যমেই জীবনের সফলতা এবং আল্লাহর নৈকট্য।

সানায় আমরা কী বলি

সানা নামাজের ভেতরের একটি অংশ। আল্লাহু আকবর বলে তাকবিরে তাহরিমা বাঁধার পর প্রথম যে কাজটি করতে হয়, তা হলো- সানা পড়া। এ জন্য এটাকে শুরু করার দোয়া বলা হয়। এটিকে 'দোয়ায়ে ইসতিফতাহ'ও বলা হয়।

কেননা এটি তাকবিরে তাহরিমার পর পড়তে হয়। এটি মহান আল্লাহ তাআলার জন্য বান্দার পক্ষ থেকে মানপত্রও বটে।

আর এটি পুরো নামাজের প্রথম রাকাতে একবারই পড়তে হয়। আবু সাঈদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ শুরু করে (তাকবিরে তাহরিমার পর) বলতেন-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআ-লা জাদ্দুকা, ওয়ালা ইলাহা গায়রুক।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তুমি প্রশংসাময়, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা অতি উচ্চে। আর তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই" (সহিহ বুখারি: ৮০৪)।

নামাজে সুরা ফাতিহায় আমরা কী বলে থাকি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহি-ম।
শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۞

আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আ-লামি-ন।
"যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা"।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

আররহমা-নির রহি-ম।
"যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু"।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞

মা-লিকি ইয়াওমিদ্দি-ন।
"যিনি বিচার দিনের মালিক"।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞

ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাসতাঈ'-ন
"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি"।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞

ইহদিনাস সিরা-তাল মুসতাকিম
"আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও",

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞

সিরা-তাল্লা যিনা আনআ'মতা আ'লাইহিম ।
"সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ"।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

গাইরিল মাগদুবি আ'লাইহিম ওয়ালা দ্দ-ল্লি-ন।
"তাদের পথ নয়, যার তোমার অভিশাপ গ্রস্থ এবং যারা পথভ্রষ্ট"।

সুরা ইখলাস-এ আমরা কী বলে থাকি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহি-ম।

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۞

কু'ল হুয়া ল্লা-হু আহাদ

"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক",

اللّٰهُ الصَّمَدُ ۞

আল্লা-হু স্সমাদ

"আল্লাহ অমুখাপেক্ষী",

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞

লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইয়ুলাদ

"তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি"

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۞

ওয়া লাম ইয়াকু ল-লাহু কুফুওয়ান আহাদ!

"এবং তার সমতুল্য কেউ নেই"।

সুরা ফালাক-এ আমরা কী বলে থাকি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহি-ম।

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞

কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক।

"বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার",

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞

মিন শাররি মাখালাক্ব।

"তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে",

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞

ওয়া মিন শাররি গাসিক্বিন ইযা অক্বাব।

"অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়",

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۞

ওয়া মিন শাররিন নাফ্ফাসাতি ফিল্ উকাদ।

"গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে"

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ।

"এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে"।

সুরা নাস-এ আমরা কী বলে থাকি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহি-ম।

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞

কুল আ'উযুবিরব্বিন্না-ছ।
বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার,

مَلِكِ النَّاسِ ۞

মালিকিন্না-ছ
মানুষের অধিপতির,

إِلٰهِ النَّاسِ ۞

ইলা-হিন্না-ছ।
মানুষের মা'বুদের

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞

মিন শাররীল ওয়াছ ওয়া-ছিল খান্না-ছ।
তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্নগোপন করে,

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ ۞

আল্লাযি ইউওয়াছ ইসু ফী সুদুরিন্নাছ-।
যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۞

মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-ছ।
জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

সুরা আসর-এ আমরা কী বলে থাকি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহি-ম।

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

وَالْعَصْرِ ۞

ওয়াল 'আসরি।

"কসম যুগের (সময়ের)"

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞

ইন্নাল ইনছা-না লাফী খুছর।

"নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত"

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ

"কিন্তু তারা নয়",

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ওয়া আমিলুসসা-লিহা-তি

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে"

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۞

ওয়া তাওয়া-সাওবিল হাক্কি, ওয়া তাওয়া-সাও বিসসাবরি।

"এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের"।

সুরা কাওছার-এ আমরা কী বলে থাকি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহি-ম।

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ؕ

ইন্না আ'তইনাকা লকাওছার

"আমি তোমাকে (হাওযে) কাওছার দান করেছি"।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ؕ

ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার

"কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় কর এবং কুরবানি কর"।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

ইন্না শানিআকা হুআল আবতার

"(তোমার নাম-চিহ্ন কোনো দিন মুছবে না, বরং) তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরাই নাম চিহ্নহীন-নির্মূল।

সুরা কদরে আমরা কী বলি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহি-ম।

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞

ইন্না-আনঝালনাহু ফী লাইলাতিল কদর।

"নিশ্চয়ই আমি এটা (অর্থাৎ কুরআন) শবে কদরে নাজিল করেছি"।

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞

ওয়ামা-আদরা-কা-মা-লাইলাতুল কদর।

"তুমি কি জান শবে কদর কী?"

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۞

লাইলাতুল কদরি খাইরুম মিন আলফি শাহর।

শবে কদর এক হাজার মাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۞

তানাজ্জালুল মালাইকাতু-ওয়াররুহু ফীহা-বিইযনি রব্বিহিম মিন কুল্লি আমর।

"সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে অবতীর্ণ হয়"।

سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۞

সালা-মুন হিয়া হাত্তা-মাতলা'ইল ফাজর।

"সে রাত (আদ্যোপান্ত) শান্তি ফজরের আবির্ভাব পর্যন্ত"।

তাশাহহুদ-এ আমরা কী বলে থাকি

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُولُهٗ.

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াত-ত্বায়্যিবাতু; আস-সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ; আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালিহীন; আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

"সব মৌখিক ইবাদত আল্লাহর জন্য। হে নবি! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ বা উপাস্য নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল"।

দরুদে ইবরাহিম-এ আমরা কী বলে থাকি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ, ওয়াআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বল্লাইতা আলা ইবরা-হীম ওয়াআলা আ-লি ইবরা-হিম, ইন্নাকাহামিদুম মাজিদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদ ওয়াআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হিম ওয়াআলা আ-লি ইবরা-হিম, ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেভাবে বর্ষণ করেছেন ইবরাহিম আ. ও তাঁর এর পরিজনের প্রতি, নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাজিল করুন, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিজনের প্রতি যেভাবে আপনি বরকত নাজিল করেছেন ইবরাহিম আ. ও তাঁর এর পরিজনের প্রতি, নিশ্চই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত"।

দোয়ায়ে মাসুরায় আমরা কী বলে থাকি

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

আল্লাহুম্মা ইন্নি জালামতু নাফসি জুলমান কাসিরা । ওয়ালা ইয়াগ ফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা। ফাগফির লি, মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা; ওয়ার হামনি, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহিম।

হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়।

চারটি বিষয় থেকে পানাহ চাওয়ার জন্য আমরা কী বলে থাকি

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ সালাতের শেষে (আত্তাহিয়াতু পড়ে) যেন আল্লাহর কাছে ৪টি জিনিস থেকে পানাহ চায়: জাহান্নামের আজাব, কবরের আজাব, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা, এবং মাসিহুদ দাজ্জালের অনিষ্ট'। আর তা হল–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিন আজাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আজাবিল কাবর, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসিহ দাজ্জালের অনিষ্ট থেকে" (মেশকাত: ৯৪০)।

কুরআনে বর্ণিত ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু দোয়া

সুরা আরাফ আয়াত ২৩ (আদম আ.-এর দোয়া)

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(রব্বানা জ্বলামনা আনফুছানা ওয়াইল লাম তাগফির লানা ওতার হামনা লানাকুনান্না মিনাল খছিরীন)

"হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর জুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব"।

সুরা বাকারা আয়াত ১২৭ (ইবরাহিম আ.-এর দোয়া)

ইবরাহিম আ. ও তার পুত্র ইসমাইল আ. কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপনের সময় তাদের এই কাজ কবুল করার জন্য দোয়া করেছিলেন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۝

(রব্বানা তাকাব্বাল মিননা, ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলীম)

"হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে (এ আমল) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।

সুরা আলে-ইমরান আয়াত ১৭৩ (ইবরাহিম আ.-এর দোয়া)

যখন ইবরাহিম আ.-এর সম্প্রদায় তাঁর বিশ্বাসের জন্য তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল, তখন তিনি এই দোয়া পাঠ করেছেন। পরবর্তীতে আল্লাহ আগুনকে তাঁর জন্য 'শীতল এবং নিরাপদ' করার নির্দেশ দিয়েছেন।

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ۝

(হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল)

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট; আর তিনি কত ভালো কর্মবিধায়ক"।

সুরা বাকারা আয়াত ২০১ (মুহাম্মদ স.-এর সুপারিশকৃত দোয়া)

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞

(রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও, ওয়াকিনা আজাবান্নার)

"হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন"।

সুরা আল-আম্বিয়া আয়াত ৮৭ (ইউনুস আ.-এর দোয়া)

সে (ইউনুস আ.) অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল,

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞

(লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জ্বলিমীন)

"তুমি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র মহান। আমি তো সীমালঙ্ঘনকারী"।

সুরা আলে- ইমরান ৩৮ (জাকারিয়া আ.-এর দোয়া)

যাকারিয়্যা আ. নিঃসন্তান ছিলেন। যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ তাআলা ফলের মওসুম ছাড়াই মারইয়ামকে ফল দান করেছেন, তখনই তার মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল এবং তার মনে হলো যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ মওসুম ছাড়াই যদি ফল দিতে পারেন, তবে বৃদ্ধ দম্পতিকে হয়ত সন্তানও দেবেন। বললেন,

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ۞

(রব্বি হাবলী মিল্লাদুনকা যুররিইইয়াতান তাইয়িবাতান ইন্নাকা ছামীউদ্দুআই।)

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে সৎ বংশধর দান করো। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শোন"।

সুরা আল-আম্বিয়া আয়াত ৮৩ (আইয়ুব আ.-এর দোয়া)

দীর্ঘকাল কঠিন রোগে এবং চরম দুঃখ-কষ্টে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে এই প্রার্থনা করেন।

(رَبِّ) اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ۞

(রব্বি) আন্নি মাসসানিয়াদ দুররু ওয়া আনতা আরহামুর রহিমিন;

"আমি দুঃখকষ্টে পড়েছি, তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু"।

সুরা কসাস আয়াত ২৪ (মুসা আ.-এর দোয়া)

মুসা আ. বিদেশে অনাহারে কাটাচ্ছেন। তিনি এক গাছের ছায়ায় এসে আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দোয়া করার একটি সূক্ষ পদ্ধতি।

رَبِّ اِنِّیْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ ۞

(রব্বি ইন্নি লিমা আনযালতা ইলাইয়্যা মিন খাইরিন ফাকির)

"হে আমার প্রতিপালক! যে-অনুগ্রহই তুমি আমার প্রতি করবে আমি তা-ই চাই"।

'খইরিন' শব্দটির অর্থ কল্যাণ। এখানে তিনি আহার্য হতে শুরু করে যাবতীয় কল্যাণের জন্য আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী হলেন। [কুরতুবী]

সুরা তওবা আয়াত ১২৯ (মুহাম্মদ স.-এর সুপারিশকৃত দোয়া)

حَسْبِیَ اللّٰهُ ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۞

(হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু, আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজিম)

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য নেই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি, আর তিনি মহা আরশের অধিপতি"।

সুরা আল-বাকারা আয়াত ২৮৬

অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাযোগ্য। যেসব কাজ ইচ্ছে করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। কুরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের মত শাস্তিও যেন এ উম্মতের উপর না আসে, তার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতে বলা হয়েছে-

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۫ وَاغْفِرْ لَنَا ۫ وَارْحَمْنَا ۫ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(রব্বানা লা-তু আখজিনা-ইন নাসিনা- আও আখত'না। রব্বানা ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইসরান কামা হামালতাহু আলাল্লাজিনা মিন কবলিনা। রব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা তকাতালানা বিহ। ওয়াআ'ফু আন্না, ওয়াগ ফিরলানা, ওয়ার হামনা। আংতা মাওলানা, ফানছুরনা আলাল কওমিল কাফিরিন)

"হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির (তথা অত্যাচারী, অবাধ্য) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন"।

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা বিনয়ী ছাড়া সকলের নিকট কঠিন। (সুরা বাকারা: ৪৫)

রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যাহারা এ মাস পাবে, তারা যেন রোযা পালন করে। (সুরা বাকারা: ১৮৫)

হে মুমিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।
(সুরা আল-জুমু'আ: ৯)

কোরআন বুঝে পড়ি
কল্যাণ ও প্রশান্তির পথ চলি

Marzia Karim Foundation